বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত,
এম. এ., বি. টি., ডব্লু. বি. ই. এস্.
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (স্পেশাল কেডার)

ভা র তী বু ক স্ট ল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৫

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, হইতে শ্রীহৃষীকেশ বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস হইতে শ্রীসন্তোষকুমার ধর কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

1533

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা

—:০:—

ছোটদের ভাষা-শিক্ষা

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখা যায়, শিশু পাঁচ-ছয় বৎসরের হইলেই বাপ-মা তাহাকে একখানি 'প্রথম ভাগ' কিনিয়া দেন এবং অ, আ, ক, খ ইত্যাদি মুখস্থ করাইতে আরম্ভ করেন। অক্ষরের সহিত পরিচয় হইলে আরম্ভ হয় শব্দ-পরিচিতি। শিশুর কাছে অর্থহীন দুই, তিন বা চারি অক্ষরযুক্ত ক্রমশঃ বর্ধমান শব্দ শিশুকে জোর করিয়া শিখানোর পরই আরম্ভ হয় বাক্যের সহিত পরিচয়। এখানেও দেখা যায় যে, যে বাক্যগুলির সংযোজন করা হয়, তাহার বেশীর ভাগেরই শিশুর বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না।

আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব, যে উপায়ে শিশুকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা মনস্তত্ত্বসম্মতও নহে এবং শিশুর পক্ষে আনন্দদায়কও নহে।

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে আমরা যখন শিশুদের ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হই, তখন শিশুর জ্ঞান-ভাণ্ডার কিরূপ সমৃদ্ধ এবং তাহার ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতা কতটা আছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশু পারিপার্শ্বিক জিনিষের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। কোন দ্রব্য দেখাইলে তাহার নাম বলিতে পারে, কোন নাম বলিলে সেই নামের দ্রব্য দেখাইতে পারে। তাহার বাড়ী ও আশপাশের জিনিষের নাম মোটামুটিভাবে জানে। এই বয়সে শিশু তাহার মনের ভাবও একরকম প্রকাশ করিতে পারে। এই বয়সে আমাদের প্রধান সমস্যা হইতেছে যে, শিশু যে কথা বলে বা বুঝিতে পারে এবং যে দ্রব্য

চিনে বা নাম বলিতে পারে, তাহার লিখিত-রূপের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া। ক্ষুধা পাইলে শিশু বলে, "মা ভাত দাও" এবং মা খাবার দিয়া শিশুকে খাইতে ডাকিলে সে অর্থ বুঝিতে পারে ও খাইতে বসে ; কিন্তু মুখে না বলিয়া "মা ভাত দাও", "খোকা খেতে এস", এই কথাগুলি যদি লিখিয়া শিশুর সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে শিশু কিছুই হয়ত বুঝিবে না। যে-কোন একটি জিনিষকে তিন দিক হইতে দেখা যাইতে পারে—বাস্তবরূপ, নাম এবং লিখিত-রূপ। পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশু তাহার পারিপার্শ্বিক দ্রব্যের সহিত পরিচিত এবং নামও জানে ; সে কেবল তাহার জানা জিনিষের লিখিত-রূপের সহিত অপরিচিত। শিশু পাঁচ-ছয় বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্বেই প্রকৃতি শিক্ষক মহাশয়ের কাজ অনেকটা আগাইয়া রাখে। শিক্ষককে এখন চিন্তা করিতে হইবে, কত সহজে এবং অল্প সময়ে শিশুকে তাহার জানা জিনিষের লিখিত-রূপের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য এবং অন্যের কথা বুঝিতে পারিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাব-প্রকাশের unit অক্ষরও নহে, শব্দও নহে। বাক্য বা বাক্যাংশ দ্বারাই আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। ভাব-প্রকাশের যে স্বাভাবিক unit বাক্য বা বাক্যাংশ, সেখান হইতেই আরম্ভ হওয়া উচিত শিশুর ভাষা-শিক্ষা। পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশুর হাতে আমরা যখন 'প্রথম ভাগ' দিই এবং অ, আ, ক, খ ইত্যাদি মুখস্থ করাই, তখন একবারও কি ভাবিয়া দেখি, ইহা স্বাভাবিক বা মনোবিজ্ঞানসম্মত কি না। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির কোন মূল্যই শিশুর কাছে নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ণমালা শিখিতে কোন শিশুরই আগ্রহ নাই। প্রহারের বা বকুনির ভয়ে সকল শিশুই বর্ণমালা মুখস্থ করে বটে কিন্তু যে সময় ও সামর্থ্য ইহার জন্য দেওয়া হয়, ঠিক পথে চালিত হইলে তাহার দ্বারা শিশুর ভাষা-শিক্ষা অনেক দূর আগাইয়া যাইত।

আজকাল অনেকেই স্বীকার করিতেছেন যে, শিশুর ভাষা-শিক্ষা সুরু হওয়া উচিত বাক্যের দ্বারা। বাক্যের দ্বারা ভাষা-শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু

বইও লেখা হইয়াছে। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাক্য দিয়া শিশুর ভাষা-শিক্ষা আরম্ভ হইবে ইহা সত্য, কিন্তু বাক্য কি প্রকারের হইবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দুই-একখানা চল্‌তি বই হইতে উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। একখানি বই-এর প্রথম পাঠ নিম্নলিখিত রূপ :—

এটা কি? এটা বল। বল কই? বল আন। বল ধর ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখানে আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে—বল কি শিশুর প্রাথমিক আগ্রহের জিনিষ? শিশুর আহার, ভাইবোনের সঙ্গে কথাবার্তা, হাসিকান্না, ছোট ছোট গল্প আরও বেশী আনন্দদায়ক নয় কি? শিশু-শিক্ষায় প্রথম স্তরে কর্ম (action) অপেক্ষা ছোট ঘটনার সহজ বর্ণনাই হৃদয়গ্রাহী হয় বলিয়া মনে হয়।

প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার জন্য ছোট ছোট বাক্য সংগ্রহ করিতে হইবে শিশুর অতি ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্য হইতে। শিশু তাহার গৃহে, বিদ্যালয়ে বা পথে প্রায়ই বলিয়া থাকে বা অন্য কাহাকেও বলিতে শুনে, এই প্রকার সহজ ছোট বাক্যের মাধ্যমেই আরম্ভ হইবে শিশুর ভাষা-শিক্ষা। শিশু তাহার মা-বাপ বা আত্মীয়-স্বজনকে প্রায়ই বলিতে শোনে, "সকাল হ'য়েছে! রোদ উঠেছে!" ইত্যাদি কথা। সেইরূপ হাত-মুখ ধোওয়া, ভাত খাওয়া, খেলা করা ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্তাও শিশু প্রতিদিনই বলে ও শোনে। অতএব, এই সব চল্‌তি সহজ বাক্যের মাধ্যমেই শিশুর ভাষা-শিক্ষা করিতে হইবে।

ভাষা-শিক্ষার প্রথম স্তরে যে সকল বাক্যের অবতারণা করা হইবে, তাহার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। প্রথম দিকের একটি পাঠে চারি-পাঁচটির বেশী বাক্য থাকিবে না। এই বাক্যগুলির মধ্যে একই শব্দের পুনরুল্লেখ থাকিবে কয়েকবার করিয়া। এই বাক্যগুলি লিখিত হইবে চল্‌তি ভাষায়। এখন যে সকল পাঠ্য-পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিতেই দেখা যাইবে সাধু ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ইহাতে কিন্তু শিশুদের শিক্ষার পথে অন্তরায়ই সৃষ্টি করা হয়। শিশু সকল সময় শোনে চল্‌তি ভাষা এবং পুস্তক পড়িবার সময় দেখে ভাষার পার্থক্য।

শিশুদের ভাষা-শিক্ষা প্রসঙ্গ তিনটি দিক হইতে আলোচনা করা দরকার। (১) কথাবার্তা বলা, (২) লিখিত ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে পারা এবং (৩) লেখা। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে কথাবার্তার স্থান নাই বলিলেই চলে। শিশুদের মনে নানা বিষয়ে আগ্রহ জাগে এবং তাহারা আমাদের কাছে প্রশ্নও করে। কিন্তু আমরা অনেক সময় ধমক দিয়া প্রশ্নের উৎস বন্ধ করিয়া দিই এবং অল্প বয়সেই শিশুর অনুসন্ধিৎসার টুঁটি টিপিয়া মারি। বিভিন্ন উপায়ে শিশুর আগ্রহ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ দিতে হইবে। ইহাতে শিশুর ভাব-প্রকাশ করিবার শক্তি বাড়িবে এবং শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।

বাক্যের মাধ্যমে শিশুদের ভাষা-শিক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্তন করিবার পূর্বে আমাদের একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রত্যেক বয়সের শিশুরা মোটামুটি কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে। তাহার তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কোন্ বয়সে সকল শিশুই কোন্ কোন্ শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করে, পরীক্ষা দ্বারা তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, তালিকা বহির্ভূত শব্দ যেন ব্যবহৃত না হয়। যে বাক্যগুলি আমরা শিশুদের সম্মুখে ধরিব তাহা সহজ হইবে এবং শিশুর পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বাহিরে না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিশুকে লেখা শিখানো বিষয়েও আমরা ঠিক পথে চলি না। অনেকেই বলেন, শিশুর হাতের লেখা সুরু হইবে হিজিবিজি হইতে। হিজিবিজির মধ্য হইতে শিক্ষক পরিচালনা করিয়া অক্ষরের রূপ বাহির করিবেন; অক্ষর যোগ করিয়া শব্দ তৈয়ারী করিতে শিখানো হইবে এবং কয়েকটি শব্দ একত্র করিয়া বাক্য তৈয়ারী করিতে শিখানো হইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই পদ্ধতি শিশুকে আনন্দ দিবে না এবং ইহা স্বাভাবিকও নহে। পড়িতে শিখিবার সময় সে আরম্ভ করিবে বাক্য হইতে, আর লিখিতে শিখিবার সময় আরম্ভ

করিবে অক্ষর হইতে—ইহা কি যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে! আমরা কি একমুখে দুই কথা বলিতেছি না। আমার মনে হয়, যে সকল ছোট ছোট বাক্য দিয়া শিশুর ভাষা-শিক্ষা আরম্ভ হইবে, সেই সকল বাক্য দিয়াই শিশুকে লিখিতে উৎসাহিত করা দরকার। প্রথম পড়িবার সময় শিশু যেমন জানে না কোন্ অক্ষরের পর কোন্ অক্ষর আসিতেছে, সেইরূপ প্রথম লেখার সময়ও শিশু প্রতি অক্ষরের সহিত পরিচিত না হইতেও পারে।

ছয়-সাত বৎসরের শিশু আত্মকেন্দ্রিক। ভাষা-শিক্ষা বিষয়ে শিশুর আত্ম-কেন্দ্রিক প্রবৃত্তির সাহায্য লইয়া কাজ করিলে আমরা তাড়াতাড়ি শিশুকে ভাষা শিক্ষা দিতে পারিব বলিয়া মনে হয়। শিশুর সহিত সম্পর্কবিহীন একজন লেখকের পুস্তক দিয়া ভাষা-শিক্ষা আরম্ভ করা অপেক্ষা শিশুর স্বরচিত বা তাহার দরদী শিক্ষকের রচিত পুস্তকই শিশুর হাতে দেওয়া ভাল। প্রত্যেক শিশুর হাতে থাকিবে এক-একখানি খাতা। শিশুরা তাহাদের খাতায় নিজের ইচ্ছামত রং বা রঙীন খড়ি দিয়া ছবি আঁকিবে। শিক্ষক মহাশয় সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সহিত শিশুর ছবির সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। ছবিতে শিশু যে ভাব প্রকাশ করিতে চাহে, দুই-একটি সহজ বাক্যের সাহায্যে শিক্ষক তাহা লিখিয়া দিবেন। যদি শিশু সত্যই শিক্ষককে ভালবাসে, অন্য কথায় শিক্ষক যদি শিশুকে ভালবাসেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ছবির নীচে শিক্ষকের লেখার পাশে শিশু নিজে লিখিবার ও পড়িবার চেষ্টা করে। এইরূপে নিজের রচিত পুস্তকের সাহায্যে আরম্ভ হইবে শিশুর ভাষা-শিক্ষা।

ছন্দের প্রতি শিশুদের অন্তরের টান আছে। নিজের নিজের বাড়ীতে অনেকেই দেখিয়াছেন, দুরন্ত ছেলেদের ও মেয়েদের ঠাকুরমা, দিদিমা ছড়া বলিয়া কেমন শান্তশিষ্টের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসাইয়া রাখেন। ছয়-সাত বৎসরের শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে, সে তখন অনেকগুলি ছড়ার সহিত পরিচিত। গানের সম্মোহিনী শক্তি শিশুদের উপর খুব বেশী ক্রিয়া করে। ভাষা-শিক্ষা বিষয়ে গান ও তাহার শোনা ছড়ার দাম অনেক বেশী। শিশুদের উপযোগী সুরুচি-

সম্পন্ন ছড়া সুন্দর করিয়া লিখিয়া দেওয়ালের চারিধারে টাঙ্গাইয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে সেগুলি আবৃত্তি করিলে শিশুর মনে ইচ্ছা আসিবে ছড়াগুলি পড়িবার ও লিখিবার জন্য। সহজ ভাষায় লিখিত শিশুদের উপযোগী ছোট ছোট গান শিক্ষক মহাশয়ের সংগ্রহ করা দরকার। শিক্ষক মহাশয় যদি নিজে গান জানেন তবে ভাল হয় ; আর না জানিলে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনদের যাঁহারা গান জানেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া শিশুদের গান শুনাইবেন। যে গান শিশুদের খুব ভাল লাগে, সেগুলি পরিষ্কার কাগজে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিয়া দিলে শিশুদের মনে পড়িবার আগ্রহ জন্মিবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দেশের মহাপুরুষদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা উচিত। সেই সময়ে মহাপুরুষদের ছবি আঁকিতে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। যদি শিশু নিজে আঁকিতে না পারে, তবে শিক্ষক মহাশয় নিজে বা অপর কাহারও দ্বারা আঁকাইয়া লইবেন। ছবির নীচে মহাপুরুষদের বাণী সহজ কথায় লিখিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত। শিশু যখনই মহাপুরুষদের ছবি দেখিবে, তখনই তাহার নীচে কি লেখা আছে তাহা জানিবার জন্য এবং পড়িবার জন্য আগ্রহান্বিত হইবে।

আজকাল আমাদের দেশে দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি সংবাদপত্রের সমধিক প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় যথেষ্ট ছবি থাকে। আমরা শিশুদের হাতে পত্রিকা দিয়া ছবিগুলি কাটিয়া "অ্যালবাম" (Album) তৈয়ারী করিতে উৎসাহিত করিতে পারি। অ্যালবামে বসানো ছবির নীচে শিক্ষক সহজ ভাষায় এবং অল্প কথায় ছবির বর্ণনা লিখিয়া দিয়া বিদ্যালয়-গৃহের এমন স্থানে টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে সকলের দৃষ্টি সহজে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। বিদ্যালয়-কক্ষে "প্রাকৃতিক মাসপঞ্জী" (Nature Calendar) থাকিবে। আবহাওয়া জ্ঞাপক কতকগুলি সহজ ও সরল বর্ণনা বিভিন্ন মোটা কাগজে স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিবে। শিশুরা বিশেষ করিয়া শ্রেণী-মন্ত্রী প্রতিদিনই বিভিন্ন চার্ট (Chart) হইতে সেদিনের আবহাওয়া বর্ণনাসূচক চার্টটি বাহির করিয়া মাসপঞ্জীতে লাগাইয়া দিবেন। শিশুরা

বিদ্যালয়ে প্রত্যহ যে সকল কাজ করিয়া থাকে, তাহার বর্ণনাও সহজ ভাষায় লিখিয়া দেওয়ালের চতুর্দিকে টাঙ্গাইয়া রাখা দরকার।

শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রথম কথা হইতেছে যে, শিশুকে বিভিন্ন কাজ ও আলোচনার মধ্য দিয়া তাহার পরিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ছোট ছোট সহজ বাক্যের সহিত পরিচিত করাইয়া দিতে হইবে। বিভিন্ন বাক্যগুলির মধ্য হইতে একই শব্দের প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। Matching Card-এর সাহায্যও লওয়া যাইতে পারে। কতকগুলি প্রচলিত শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া Matching Card-এ লিখিত অক্ষরগুলির দ্বারা শব্দ পুনর্গঠন করা শিখানো যাইতে পারে। চল্‌তি পদ্ধতিতে আমরা শিশুকে প্রথমে অক্ষরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিই, তারপর আসে শব্দ এবং সকলের শেষে আসে বাক্য। কিন্তু নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে ভাষা-শিক্ষা সুরু হইবে ঠিক বিপরীত দিক হইতে।

ছোটদের ভূগোল-শিক্ষা

এমন শিশু খুব কমই দেখা যাইবে, ভূগোল পড়িতে যাহার ভাল লাগে। ভূগোল কি সত্যই এমন নীরস জিনিষ যে, শিশুর মন কিছুতেই তাহার কাছ দিয়া যাইতে চাহে না। আমার মনে হয়, ভূগোলের যে নীরসতা এবং ইহার প্রতি ছাত্রদের যে ভীতি, তাহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী করা যায় শিক্ষক ও তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান গলদ হইল বিভিন্ন পাঠ্য-তালিকা এবং শিশুর জীবনের সহিত সম্বন্ধবিহীন পাঠ্যক্রম। বিদ্যালয়ে শিশু যে সময়টি থাকে, তাহাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক-একটি ভাগ শেষ হইলে বাজে একটা করিয়া ঘণ্টা। বাংলা সাহিত্যের আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট ঘণ্টায় সাহিত্য ছাড়া আর কোন বিষয়ে আলোচনা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হয় না এবং আলোচনা করিতেও দেওয়া হয় না। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে।

এখন আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে, শিশুরা বিভিন্ন বিষয় পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথকভাবে গ্রহণ করিতে পারে কিনা। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অল্প বয়সে শিশুদের জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞান দিতে হইবে। শিশু কোন কাজ করিবার সময় তাহার মনের আবেগে কাজ করিয়া যায়। তাহার কাজের মধ্যেই থাকে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান। শিশুর কাজকে মাধ্যম করিয়াই বিভিন্ন বিষয় যতটুকু স্বাভাবিকভাবে সম্ভব তাহার অবতারণা করিতে হইবে। সাধারণভাবে এই কথাগুলি সকল বিষয়েই প্রয়োগ করা যায়; তথাপি শিশুদের ভূগোল-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার।

প্রথম কথা, আমাদের ভাবিতে হইবে আমরা শিশুদের ভূগোল শিক্ষা দিব কেন এবং ৬।৭ বৎসরের শিশুকে আমরা কতদূর শিখাইতে চেষ্টা করিব। আমার মনে হয়, এই বয়সে যদি আমরা শিশুকে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে এবং নিজের গ্রাম বা দেশ ছাড়া পৃথিবীতে আরও অনেক দেশ আছে—এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়া দেশ-বিদেশের কথা জানিবার আগ্রহ জাগাইয়া দিতে পারি; তাহা হইলে আমাদের কাজ একরকম শেষ হইবে তাহা বলা যাইতে পারে।

শিশুদের ভূগোল-শিক্ষা দিবার সময় তিনটি দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুকে সুযোগ দিতে হইবে—(১) পর্যবেক্ষণ করিবার, (২) পর্যবেক্ষণ আবিষ্কার করিবার এবং (৩) তাহার দেখা ও আবিষ্কার করা জিনিষকে রূপ দিবার জন্য হাতের কাজ করিবার। এখন আমাদের দেখা যাউক, কি করিয়া আমরা শিশুদের এই সুযোগ দিতে পারি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভূগোল পাঠের তালিকাতে দেখিতে পাই, ভৌগোলিক সংজ্ঞা, দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ, পৃথিবীর আকৃতি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী, উৎপন্ন দ্রব্য ও রেলপথ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ে গণ্য হইয়াছে। সুকুমারমতি শিশুদের কি এই নীরস জটিল বিষয় ভাল লাগিতে পারে ? শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই জিনিষগুলি জোর করিয়া গলাধঃকরণ করাইতে গিয়া ভূগোলের প্রতি আমরা যদি শিশুদের একটা বিতৃষ্ণা জাগাইয়া তুলি, তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কি আছে ?

শিশুদের বাড়ী ও বিদ্যালয়ের আশপাশে কি আছে, ইহা জানাই ভূগোল-পাঠের প্রধান সোপান। ছেলেদের বাড়ীতে কয়টা ঘর আছে, কোন্ ঘরটা কোন্ মুখো, কোন্ ঘরে দিনের কোন্ সময় রোদ বেশী পড়ে—ইহা যে বিদ্যালয়ে আলোচনার বিষয় হইতে পারে, তাহা কি আমরা কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছি ? যেদিকে সূর্য উঠে সেই দিকে মুখ করিয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইলে ডান হাতের দিক দক্ষিণ, বাম হাতের দিক উত্তর এবং

পিছনের দিক পশ্চিম—এই রকম প্রথায় শিশুদের দিক নির্ণয় করিতে শিখাইতে প্রায়ই বিদ্যালয়ে দেখা যায়। ইহা অপেক্ষা সহজে শিশুদের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে কি আমরা ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারি না? প্রত্যেক বড় গ্রামেই উত্তর-পাড়া, দক্ষিণ-পাড়া, পূর্ব-পাড়া, পশ্চিম-পাড়া ইত্যাদি নামে গ্রামের বিভিন্ন অংশ পরিচিত। আমরা বলি শীতকালে উত্তুরে হাওয়া বয়, গ্রীষ্মকালে বয় দক্ষিণা হাওয়া। দিক সম্বন্ধে যে সকল কথা শিশুরা নিত্য শোনে, সেই সকল কথার সূত্র ধরিয়া আমরা শিশুদের দিক সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারি।

চল্‌তি বিদ্যালয়ে আমরা শিশুদের ছয়টা ঋতুর নাম মুখস্থ করাই; কিন্তু সত্যিই কি শিশুদের কাছে ছয়টি ঋতুর বিশেষ কোন মূল্য আছে? শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই তিনটি ঋতুর অনুভূতি শিশুদের আছে; কাজেই প্রথমে শিশুদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়াই যদি শিশুদের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এই তিনটি ঋতু সম্বন্ধে বলা হয়, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় কোন্ ফসল কোন্ সময় চাষ করিতে হয়, এবং কোন্ সময়ে ফল পাওয়া যায় ইত্যাদি আলোচনার দ্বারা আমরা শিশুদের ঋতু সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারি।

পৃথিবী গোল—এই কথাটি শিশুদের বুঝাইবার জন্য আমরা নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকি। দূর হইতে একখানা জাহাজ আসিলে প্রথমে তাহার মাস্তুল দেখা যায়। তারপর দেখা যায় জাহাজের অন্যান্য অংশ। ফরাসী দেশে কোন্ কালে কুকো নামে কোন একজন বৈজ্ঞানিক দোলক সাহায্যে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে কি তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন? কোন বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর তিনটি কাঠির মাথা পরস্পর সূতা দিয়া বাঁধিয়া ভাসাইয়া দিলে সকল মাথাগুলিকে এক সরলরেখায় দেখা যায় না,—ইত্যাদি শিশুদের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পৃথিবী যে গোল ইহা প্রমাণ করিতে চাই। পৃথিবী গোল কিংবা চ্যাপ্টা ইহা যদি শিশু না জানে, তাহা হইলে ভাগবত অশুদ্ধ হইবে না; কাজেই এ-সব কঠিন জিনিষ বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া আমরা

যদি গ্রামে কত লোকের বাস, তাহাদের জীবিকা কি ইত্যাদি বিষয়ে গল্পচ্ছলে আলোচনা করি, তাহা হইলে শিশুরা আনন্দ পাইবে এবং তাহাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইবে।

গ্রামে বা গ্রামের কাছাকাছি কোন জায়গায় বাজার বা হাট আছে দেখা যায়। শিশুদের মাঝে মাঝে হাটে বা বাজারে লইয়া যাইতে পারি, হাটে বা বাজারে কি কি জিনিষ বিক্রয় হয়—তাহার কোন্‌গুলি গ্রামেই উৎপন্ন হয় এবং কোন্‌গুলি বাহির হইতে আসে, ইহা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করা যাইতে পারে।

গ্রামের কোন্ জায়গায় হাট বা বাজার বসে এবং কেন বসে ইত্যাদি বিষয়ে জানিবার জন্য শিশুদের অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। একখানা Post Card বা খামে চিঠি লিখিয়া একটি লাল বাক্সে ফেলিয়া দিলে কেমন করিয়া ইহা বহুদূরে অবস্থিত আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছায়, ইহা শিশুদের বিস্ময়ের বিষয়। কৌশলী শিক্ষক শিশুদের এই আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিতে পারেন ডাক-প্রথা সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা জন্মাইয়া দিয়া। গ্রামের কাছাকাছি নদী, পাহাড়, ঝর্ণা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য থাকিলে শিক্ষক মহাশয় শিশুদের সেখানে লইয়া যাইতে পারেন এবং নদী, পাহাড় ইত্যাদির জন্মকথা শিশুর উপযোগী করিয়া বলিতে পারেন। গ্রামের নিকটবর্তী শহর কোথায় আছে, কেমন করিয়া সেখানে যাইতে হয়, এবং শিশুদের মধ্যে কেহ যদি শহরে গিয়া থাকে তাহা তাহার অভিজ্ঞতা আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রাম ও শহরে যানবাহন, বাড়ীঘর, লোকদের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুদের কিছু বলিলে ভালই লাগিবে।

শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরিয়া গল্পচ্ছলে দেশ-বিদেশের সম্বন্ধে শিশুদের কিছু ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বাংলা দেশের ছেলেরা ভাত খায়। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ এবং পৃথিবীর আর কোন্ কোন্ দেশের লোকেরা ভাত খায় ও তাহাদের ভাত খাওয়ার পদ্ধতিই বা কি, তাহা

জানিবার জন্য শিশুদের আগ্রহ জন্মানো সহজ। বাংলা দেশে বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার গ্রামে মাটির বাড়ী বেশী দেখা যায়। নানা রকমের, ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাহিরে কোথায় কি প্রকারের ঘর দেখিতে পাওয়া যায় এবং কেন একথা শিশুরা যে খুব আগ্রহের সহিত জানিতে চাহিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শিশুর অভিজ্ঞতার মধ্যে এই রকম ছোটখাট জিনিষ অনেক আছে। তাহা অবলম্বন করিয়া মনোগ্রাহীভাবে শিশুদের দেশ-বিদেশের অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

আমরা বাজার হইতে মনোহারী যে সকল জিনিষ কিনিয়া থাকি, ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায়, কোন্ দেশের তৈয়ারী এই কথাটা কোন-না-কোন স্থানে লেখা থাকে। কয়েকটি নিত্য-ব্যবহৃত জিনিষের উপর বিভিন্ন দেশের নামের পরিচয় করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ছোট ছেলেরা ছড়া ও কবিতা ভালবাসে। আমাদের দেশে দিদিমা ও ঠাকুরমার কাছে শিশুরা অনেক ছড়া শিখে, যাহাতে দেশের বিভিন্ন স্থানের নাম আছে। শিক্ষক মহাশয় এই প্রকারের ছড়া সংগ্রহ করিয়া তাহার মাধ্যমে শিশুদের ভূগোল-পাঠের সূচনা করিবেন।

একটি চলৃতি কথা আছে, "মুখে বই পড়, হাতে কাজ কর।" এতদিন পর্যন্ত আমরা বই পড়ার দিকেই জোর দিয়াছিলাম, এখন ঘড়ির দোলকটি ভিন্ন মুখে দুলিতেছে। হাতে কাজ করার দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে—একথা আজ সকল শিক্ষাবিদ্-ই স্বীকার করিয়াছেন। শিশুদের আমরা ছবি আঁকা, নক্সা করা, মডেল তৈয়ারী করা প্রভৃতি হাতের কাজে উৎসাহিত করিব।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে থাকিবে একটি সংগ্রহশালা (Museum)। সেখানে শিশুদের হাতের তৈয়ারী ও সংগ্রহ করা নানাপ্রকার জিনিষ থাকিবে। প্রত্যেক শিশুই খেলনা ভালবাসে। আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিব, বিভিন্ন স্থানের খেলনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষকরা শিশুর

সম্মুখে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট খেলনাগুলির নাম ও প্রাপ্তিস্থান বলিয়া দিলে শিশুদের বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে একটু ধারণা জন্মাইতে পারে।

অনেকে বলেন, শিশুদের কাছে দেশ-বিদেশের শিশুদের গল্প বলিয়া ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই প্রথায় শিক্ষা দেওয়া খুব মনোগ্রাহী হইবে না।

যাহাদের সম্বন্ধে শিশুরা কিছু জানে না, তাহাদের গল্প ভাল লাগার কথা নয়। ইহার পরিবর্তে আমার মনে হয়, শিশুদের পূর্ণাঙ্গ গল্প বলাই ভাল। শিশুরা হাতী, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক ইত্যাদির গল্প শুনিতে ভালবাসে। জীবজন্তুর গল্প এমন করিয়া বলা উচিত যাহাতে শিশুদের অপ্রীতিকর না হয় অথচ জীবজন্তুর স্বভাব, আবাসস্থল, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুদের একটা ধারণা জন্মাইতে পারে। অল্প বয়সে শিশুরা রোমাঞ্চকর কাহিনী (Adventure) ভালবাসে। অতএব অল্প বয়সের শিশুদের কাছে আবিষ্কারকদের কাহিনী, ভূপর্যটকদের কাহিনী বলা যাইতে পারে। ইহাতে শিশুরা আনন্দও পাইবে এবং দেশ-বিদেশের সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানও জন্মিবে।

শিশুদের কাছে নানারকম ছবি ও ছবির বই, ম্যাপ, Chart, Globe ইত্যাদি রাখা উচিত। এই সব ছবি, গল্পের বই শিশুরা যাহাতে ইচ্ছামত দেখিতে পারে সে সুযোগ দেওয়া উচিত। এই সব ছবির বই সম্বন্ধে শিশুদের জোর করিয়া কিছু বলা উচিত নয়। তবে শিশুরা যদি কিছু জানিতে চায়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া গল্পচ্ছলে ছবিগুলির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

উপরে ভূগোল-শিক্ষা সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলা হইল, ভূগোল-শিক্ষার সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা বলা চলে না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ভূগোল-শিক্ষা সম্বন্ধে যে ফলাফল পাইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

শিক্ষা-জগতে অসন্তোষ

দার্শনিকরা বলেন, অসন্তোষই নাকি উন্নতির মূল। মানুষ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলে হইয়া যায় প্রগতি-বিরোধী এবং পিছনের দিকেই তাহার টান পড়ে। অসন্তোষ যদি উন্নতির নিদর্শক হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ অচিরেই উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে। আজ ভারতবর্ষে প্রতি ক্ষেত্রেই অসন্তোষের আগুন জ্বলিতেছে—সন্তোষ আছে কোথায় তাহার সন্ধান মিলাই হইয়াছে কঠিন সমস্যা। 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর' লওয়া নাকি বিশেষ অপরাধ। শিক্ষক মানুষ—জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশান্তির খোঁজ হয়তো একটু-আধটু রাখি, কিন্তু সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইলে আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর রাখার মতই দূষণীয় হইবে বলিয়া ভয় হয়। তাই যে ক্ষুদ্র জগতে বিচরণ করিবার আমি অধিকারী, সেখানে অসন্তোষ কত ব্যাপক ও গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা আলোচনা করা বোধ হয় খুব দোষের হইবে না।

শিক্ষা-জগৎ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে তাহার প্রধান তিনটি দিক—শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের—হইতে বিচার করিতে হইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে শিক্ষককে ভুলিলে চলিবে না। একটা ঘড়ির বাহিরের দিকটা যতই চাকচিক্যময় হউক না কেন, ঘড়ির ভাল-মন্দ বিচার হইবে ঘড়ির সময় নির্দেশ করিবার ক্ষমতার উপর ; কিন্তু এই ক্ষমতা নির্ভর করে ভিতরকার main spring-এর উপর। শিক্ষা-ব্যবস্থার main spring হইতেছে শিক্ষক। যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষক সন্তুষ্টচিত্তে এবং সর্বান্তঃকরণে শিক্ষাকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিবেন, ততদিন শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমাদের দেশের শিক্ষকরা কি আজ সুখী ? একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে—ভারতবর্ষের যুবকরা শিক্ষকতা করিতে

যায় কখন ? যখন জীবন-যাত্রার সমস্ত পথ প্রায় রুদ্ধ হয়, তখনই যুবকরা শিক্ষকতা গ্রহণ করে। মেধাবী ছাত্রদের অধিকাংশই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়—কেবল জীবন-যুদ্ধে পরাজিত অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্ররাই শিক্ষকতা করিতে আসে।

শিক্ষকদের অসন্তোষ কোথায় এবং কেন ? আমাদের দেশের বড় বড় নেতারা সময়ে অসময়ে শিক্ষকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন। জাতি-গঠন, জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ গাল-ভরা বিশেষণ শুনিতে শুনিতে শিক্ষকদের কানে তালা ধরিয়া গিয়াছে। কথায় বলে, মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজে না। পেটে যাহার অন্ন নাই, ঘরে যাহাদের আচ্ছাদন নাই, পরনে যাহাদের কাপড় নাই, তাহাদের কাছে আদর্শের বড় বড় কথা বলা উলুবনে মুক্তা ছড়ানোরই মত। সরকারের ব্যয় দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বেতন-বৃদ্ধি, মাগ্যি-ভাতা ইত্যাদি দ্বারা সরকারী কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখা হইতেছে। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, জেল খাটিয়াছে এই অজুহাতে কংগ্রেসকর্মীদের বড় বড় চাকুরী, contract এবং নিদান একটা political sufferer's pension দেওয়া হইতেছে। কিন্তু যাহারা যুগের পর যুগ দেশের জন্য কাজ করিতেছে, তিলে তিলে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই শিক্ষকদের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং রহিয়া গেল। বিদেশী শাসন শেষ হইল, দেশ স্বাধীন হইল কিন্তু গরীব শিক্ষকদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হইল না। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এমন কি অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকও সরকারী অফিসের peon অপেক্ষা কম বেতন পান। বর্তমানে শ্রেণীভেদ হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাহিনা ৬২৷৷৹, ৫৭৷৷৹ এবং ৪০৲ টাকা। ক শ্রেণীর শিক্ষক যদি কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন, তাহা হইলে তিনি প্রধান শিক্ষকের ভাতা হিসাবে আরও ৫৲ টাকা পাইবেন। প্রধান শিক্ষক খ বা গ শ্রেণীর হইলে প্রধান শিক্ষকের ভাতা পাইবেন না। শিক্ষকদের এইরূপ কোন শ্রেণীভেদ করার কোন সার্থকতা

আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশের ম্যাট্রিক পরীক্ষার মান যেরূপ নিম্ন, তাহাতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াই কেহ শিক্ষকতা করিবার মত জ্ঞান ও ক্ষমতা লাভ করে কিনা, তাহাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ম্যাট্রিক যাহারা পাশ করিতে পারে নাই, তাহাদের হাতে শিশু-শিক্ষার ভার দিয়া শিশুর তথা দেশের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। Matric. ও Matric. G. T. শিক্ষকের বেতনের কোন পার্থক্য না করিয়া যে সকল Matric. পাশ শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের Training-এর ব্যবস্থা করা উচিত। প্রধান শিক্ষকের যে দায়িত্ব তাহা ক, খ বা গ যে শ্রেণীর শিক্ষককেই নিযুক্ত করা হউক তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব খ ও গ শ্রেণীর শিক্ষককে যদি প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করিতে দিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে প্রধান শিক্ষকের allowance হিসাবে ৫৲ টাকা দিতে কি বাধা থাকিতে পারে, তাহা সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। এখন কথা হইতে পারে Non-Matric. এবং Non-G. T.-দের যদি শিক্ষকতা করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এতদিন যাঁহারা এই কার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের কি করা হইবে? সরকারের অনেক বিভাগে ছোট ছোট চাকুরী আছে যাহাতে বেশী বিদ্যার দরকার করে না। Non-Matric. শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা কর্মক্ষম তাঁহাদের সেই কার্যে নিযুক্ত করা উচিত এবং যাঁহাদের বয়স হইয়াছে তাঁহাদের এককালীন কিছু টাকা (gratuity) দিয়া অবসর লইতে বাধ্য করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। শিক্ষকদের অল্প বেতন দেওয়ার ফলে মন দিয়া প্রায় কোন শিক্ষকই কাজ করেন না বলিলে চলে। প্রায় সকল প্রাথমিক শিক্ষকের দোকান, দুধ বা সব্জির ব্যবসায়, জমিদারের গোমস্তাগিরি, দলিল লেখা, Union Board-এর Secretary-র কাজ ইত্যাদি কিছু-না-কিছু অতিরিক্ত কাজ আছে। গ্রামে থাকিয়া যাহাতে একটা লোক ছোটখাট একটা সংসার মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে চালাইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষকদের বেতন নির্ধারিত করা উচিত।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যেও আছে গভীর অসন্তোষ। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের শিক্ষার আগ্রহে এবং বিত্তশালী লোকদের বদান্যতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সময় জনসাধারণের যে উৎসাহ দেখা যায়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন দিবার সময় তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির (Managing Committee) সভ্য হইয়া শিক্ষকদের উপর মাতব্বরি করিবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রবল আকারে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষকদের দিন চলিতেছে কি করিয়া, সে সম্বন্ধে খোঁজ লইবার প্রয়োজন তাহারা বোধ করে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের এমন দুই-চারিটি স্কুলের কথা জানি, যেখানে শিক্ষকের বেতন ২০৲ বা তাহারও কম ছিল। আশা করা গিয়াছিল, দেশ স্বাধীন হইলে চির-অবহেলিত শিক্ষকদের অবস্থার পরিবর্তন হইবে। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিম বাংলার সরকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির উন্নতির দিকে মন দিয়াছেন। সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে ক, খ, গ ও ঘ—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ছাত্র-সংখ্যার অনুপাতে। গুণানুসারে শিক্ষকদের বেতনের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং নির্দিষ্ট হারে শিক্ষকদের বেতন দিতে টাকার অভাব পড়িলে সরকার হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। পরিচালনা সমিতির যথেচ্ছাচার হইতে শিক্ষকদের রক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কোন শিক্ষককে নিয়োগ বা অপসারিত করিতে হইলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

কিন্তু বাংলা সরকার শিক্ষকদের বেতনের যে হার নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে যথেষ্ট নয়। একজন বি. এ. পাশ শিক্ষকের বেতন হইবে ৬০৲ হইতে ১০০৲ এবং একজন বি. এ., বি. টি. বা এম. এ., এম. টি. শিক্ষকের বেতন ৭৫৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্যন্ত। বিভিন্ন শ্রেণীর স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বেতনের হার মোটামুটি সন্তোষজনক হইয়াছে। অন্যান্য শিক্ষক ও প্রধান

২

শিক্ষকের বেতনের পার্থক্য এতই বেশী যে, তাহাতে শিক্ষকদের মধ্যে বিদ্বেষ ও অসহযোগিতার ভাব দেখা যাইতেছে। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে গুণের তারতম্য খুব বেশী আসে না। প্রধান শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া তাঁহাকে একটা ভাতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের বিশেষ করিয়া একটা grade নির্দিষ্ট করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। সমগ্র প্রদেশে ১৪।১৫টি খাস সরকারী বিদ্যালয় আছে। তাহার জন্য খরচ হয় প্রচুর। সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হার বে-সরকারী বিদ্যালয়ের বেতনের হার অপেক্ষা অনেক বেশী। সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যেক জেলায় একটি বা দুইটি আদর্শ বিদ্যালয় থাকিলে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি তাহার অনুকরণ করিয়া গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু সরকারী বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আজ আছে বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষার ফল, ছাত্রদের চরিত্র-গঠন, শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা ইত্যাদি কোন বিষয়েই সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে আজ আদর্শস্থানীয় বলা যাইতে পারে না। বে-সরকারী বিদ্যালয়ের মতই সরকারী বিদ্যালয়গুলি গতানুগতিকভাবে গড্ডালিকা প্রবাহে চলিতেছে। কাজেই মনে হয়, বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সরকারী ও বে-সরকারী এই রকম একটা পার্থক্য তুলিয়া দেওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য যেমন প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা স্কুল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে, সেইরূপ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া বোর্ড স্থাপন করা উচিত। জেলার মধ্যে সকল বিদ্যালয় এই বোর্ডের অধীনে থাকিবে, শিক্ষকদের মাহিনা, নিয়োগ, বদলী—সবই এই বোর্ড স্থির করিবেন। ছাত্রদের বেতন বাবদ যাহা আদায় হইবে তাহা সরকারী তহবিলে জমা হইবে এবং সরকার বোর্ডের মারফতে সমস্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়-ভার বহন করিবেন। সরকার পরিদর্শন-বিভাগে যথেষ্ট সংখ্যক লোক নিয়োগ করিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয় যাহাতে বৎসরে কয়েকবার পরিদর্শিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

বাংলা দেশে কয়েকটি সরকারী কলেজ ছাড়া বাকী কলেজগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এবং কতকগুলি বিত্তশালী ব্যক্তির বদান্যতায়। কলেজগুলি চলে প্রধানতঃ ছাত্রদের বেতন-লব্ধ অর্থ হইতে; সরকারী সাহায্য যে নাই তাহা বলি না, তবে সরকারী সাহায্য এতই অপ্রচুর যে তাহাতে কলেজের বাৎসরিক খরচের এক-দশমাংশ সঙ্কুলান হয় কিনা সন্দেহ! ছাত্রদের বেতন হইতে অধ্যাপকদের মাহিনা দিতে হয় বলিয়া অন্য দেশের, এমন কি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশের অধ্যাপকদের মাহিনা কম দেওয়া হয়। গত্যন্তর না থাকার দরুণ অধ্যাপকরা শুষ্কমুখে হাসি টানিয়া এবং জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেক সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়া কাজ চালাইতেছেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখা দিল, গোদের উপর বিষ ফোড়া। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া দলে দলে ছেলে মফঃস্বল হইতে আসিয়া কলিকাতার কলেজে ভর্তি হয়। জনবহুল কলিকাতায় ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা নাই। এক-একটি কলেজে অত্যন্ত বেশী ছাত্র হওয়ার জন্য পড়াশুনাও বিশেষ সুবিধা হয় না। তাহা ছাড়া অল্প বয়সে অভিভাবকহীন অবস্থায় কলিকাতার মত বিরাট শহরে থাকাকালীন অনেক ছাত্রই সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতেছে। তাই সরকার ঠিক করিলেন, যদি মফঃস্বল শহরে কতকগুলি কলেজ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে মফঃস্বলের ছেলেরা অল্প খরচে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। কলিকাতার উপরে চাপ কমিবে এবং ছাত্রদের অপরিণত বয়সে ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার সুযোগ মিলিবে কম। দেখিতে দেখিতে মফঃস্বলে ১২।১৩টি কলেজ গড়িয়া উঠিল। কিন্তু একটা বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি পড়িল না। মফঃস্বলে কলেজ হইলে কলিকাতার কলেজে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং কলিকাতার কলেজগুলিতে অধ্যাপকের প্রয়োজন হইবে পূর্বাপেক্ষা কম। নব-প্রতিষ্ঠিত মফঃস্বল কলেজে কলিকাতার কলেজগুলি হইতে অধ্যাপকদের বদলী করিলে ভাল হইত। কিন্তু বেশীর

ভাগ ক্ষেত্রেই মফঃস্বল কলেজে নূতন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইল। তাহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হঠাৎ স্থির করিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান উন্নত করিতে হইবে। হঠাৎ Matric., I. A., I. Sc. পরীক্ষার পাশের হার অপ্রত্যাশিতরূপে কমিয়া গেল। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই যে, কলেজে পড়িবার ছাত্র-সংখ্যা হঠাৎ গেল কমিয়া এবং কলেজ ও অধ্যাপকদের সংখ্যা গেল বাড়িয়া। এখন কোন কলেজেই ছাত্রদের বেতন হইতে কলেজের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে না; এখন হয় সরকারকে প্রত্যেক কলেজে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করিতে হইবে, কিংবা কলেজের কর্তৃপক্ষকে অধ্যাপক ছাড়াইয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে। জীবন-যাত্রার মান দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের ক্রমবর্ধমান জীবন-মানের সহিত তাল রাখিয়া বেশী হারে মাহিনা পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁহাদের চাকুরী থাকিবে কিনা, সেই বিষয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

স্বাধীন ভারত যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উদ্বাস্তু সমস্যাই কঠিনতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ আজ উদ্বাস্তু সমস্যার আঘাতে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্বাস্তু সমস্যার ঢেউ শিক্ষা-জগতেও লাগিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে পূর্ববঙ্গেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল বেশী। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল হিন্দুদের প্রচেষ্টায়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল অন্ততঃ শতকরা ৮০ ভাগ। বঙ্গ-বিভাগের পর প্রায় সমস্ত হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্র পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। এই সকল কর্মচ্যুত উদ্বাস্তু শিক্ষকরা সরকারের দিকে চাহিয়া আছেন, পশ্চিম বাংলার স্কুল ও কলেজে তাঁহাদের চাকুরী দিবার জন্য। সরকার পশ্চিম বাংলার সমস্ত স্কুল ও কলেজে শূন্য পদ পূর্ণ করিবার সময় উদ্বাস্তু শিক্ষকদের নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। ধীরে ধীরে উদ্বাস্তু শিক্ষকদের পশ্চিম বাংলার স্কুল ও কলেজে চাকুরী হইতেছে, কিন্তু উদ্বাস্তু শিক্ষকরা

ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা চাহেন রাতারাতি তাঁহাদের চাকুরী হউক। এদিকে পশ্চিম বাংলার শিক্ষক ও শিক্ষক-পদপ্রার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দাবী এই প্রদেশের অধিবাসীদের অগ্রগণ্য হইবে কেন? এই প্রদেশের অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটিবার পরে উদ্বাস্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা অতিথি; অতিথিদের দাবী গৃহস্থের অগ্রগণ্য হইতেছে—ইহাই পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের অভিযোগ।

শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইতেছে পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা। পাশ্চাত্ত্য দেশের পুস্তক-প্রকাশকরা পণ্ডিত লোকদের লেখা ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অর্থের থলিও পূর্ণ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, পুস্তক-প্রকাশকের শতকরা ৯০জন স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তক, অর্থ-পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। অবশ্য ইহার যথেষ্ট কারণও আছে। আমাদের দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত, তাহারা কোন পুস্তকের ধার ধারে না। তথাকথিত ডিগ্রীধারী শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া একটা চাকুরী যোগাড় করিতে পারিলেই মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। এমন কি শিক্ষা-কার্যে লিপ্ত স্কুলের শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক এবং সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কার্যরত কর্মীবৃন্দের অধিকাংশ নিজের কাজের জন্য যেটুকু অবশ্যপাঠ্য তাহার বাহিরের কোন পুস্তকাদি পড়েন না। এইরূপ অবস্থায় পুস্তক-প্রকাশকদের পাঠ্য-পুস্তক ছাপানোর দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হয়। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মতো এদেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন করিবার জন্য সরকার যখন ঠিক করিলেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পাঠ্য-পুস্তক থাকিবে না, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে যে একখানি পুস্তক থাকিবে তাহাও সরকার প্রকাশ করিবেন, তখন পুস্তক-প্রকাশকদের মধ্যে পড়িয়া গেল হট্টগোল। সকলে আন্দোলন

আরম্ভ করিলেন—সরকার নাকি ঘোর অবিচার করিতেছেন। শিক্ষক-মহলে কোথাও কোথাও অসন্তোষের আগুন ধুমাইয়া উঠিতে লাগিল। বাজারে অনেকগুলি পুস্তক থাকিলে এবং এই পুস্তকগুলির মধ্যে ২।১ খানি পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্বাচন করিবার ভার তাঁহাদের হাতে থাকিলে কিছুটা কর্তৃত্ব করা যায় এবং পুস্তক-প্রকাশকের কাছে পাওয়া যায় একটা কমিশন। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা পাঠ্য-পুস্তক লিখিয়া দিয়া কিছু কিছু অর্থ পাইয়া থাকেন। সরকারের পাঠ্য-পুস্তকের নীতি তাঁহাদের মনে জাগাইল অসন্তোষ।

আজ চারিদিকে এই অসন্তোষের লক্ষণ দেখিয়া আমাদের একটা কথা মনে হয়। দেড় শত বৎসরেরও অধিককাল ইংরাজ-শাসনে আমাদের মন হইয়াছে পঙ্গু। আমরা নিজে কোন নূতন পথ বাছিয়া লইতে পারি না। এ-বিষয়ে সরকারের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকা আমাদের স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ সরকারের অধীনে আমাদের যত অসুবিধা ছিল, স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে একদিনেই তাহা দূর হইবে—এই ধারণা যেন আমাদের বদ্ধমূল হইয়াছে। তাই কোথাও পান হইতে চূণ খসিলে অমনি আমাদের অন্তরে জ্বলিয়া উঠে অসন্তোষের আগুন, আর আমরা বিষোদ্গার করি সরকারের বিরুদ্ধে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, আজ যাঁহারা শাসকের গদিতে বসিয়াছেন তাঁহারা আমাদের লোক। যদি তাঁহারা দোষ ও ভুল-ভ্রান্তি করেন, তাহা সংশোধন করিবার সুযোগ দিতে হইবে। শিশু রাষ্ট্রের কর্মচারীদের পদে পদে বাধা দিলে দেশের উন্নতি হইতে পারে না।

বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বন

১৯৩৭ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার কথা দেশের সম্মুখে উত্থাপন করেন, তখন হইতে আজ পর্যন্ত এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যত সমালোচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে স্বাবলম্বনের দিকটাই সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু স্বাবলম্বন সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত দৃঢ়। তাঁহার মতে স্বাবলম্বনই বুনিয়াদী শিক্ষার কোষ্টি-পাথর। এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, মহাত্মাজী স্বাবলম্বী শিক্ষা বলিতে কি বুঝিয়াছেন এবং শিক্ষা কতদূর স্বাবলম্বী হইতে পারে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প বা হাতের কাজ হইবে শিক্ষার মাধ্যম। শিশুদের তৈয়ারী দ্রব্য বিক্রয় হইবে এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিদ্যালয়ের খরচ চলিবে। বিদ্যালয়ের খরচ এই কথার তাৎপর্য ভাল করিয়া বুঝা উচিত। খরচ দুই রকম —এককালীন বেশী খরচ (Capital Expenditure) এবং পৌনঃপুনিক চল্‌তি খরচ (Recurring Expenditure)। বিদ্যালয়ের জন্য জমি ক্রয় করা, বাড়ী তৈয়ারী, আসবাব-পত্র এবং সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদিকে এককালীন বেশী খরচ (Non-recurring Capital Expenditure) বলা যাইতে পারে এবং শিক্ষক মহাশয়দের মাহিনা, হাতের কাজের জন্য কাঁচামাল ক্রয় ইত্যাদি পৌনঃপুনিক চল্‌তি খরচ (Recurring Expenditure)। শিক্ষা স্বাবলম্বী হইবে অর্থে যদি কেহ মনে করেন যে, বিদ্যালয়ের এককালীন বেশী খরচ শিশুদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে সঙ্কুলান হইবে, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। Capital Expenditure সব সময়ই সরকার বা সমাজের বিত্তশালী লোকদের দিতেই হইবে। শিক্ষক মহাশয়দের মাহিনা, হাতের কাজের জন্য যে কাঁচামাল প্রয়োজন তাহার দাম ইত্যাদি Recurring Expenditure শিশুদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে কুলাইয়া যাইবে।

এখানে আরও একটা কথা তলাইয়া দেখিতে হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হইবে অর্থে ইহা বুঝায় না যে, প্রত্যেক শ্রেণীই স্বাবলম্বী হইবে। প্রথম শ্রেণীর ৭ বৎসরের শিশুর উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা সেই শ্রেণীর শিক্ষকের মাহিনা উঠিতে পারে না এবং তাহা উঠাইবার চেষ্টাও কোনও বুনিয়াদী শিক্ষক করিবেন না। শিশু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত থাকিবে। এই ৭ বৎসরের শিশুর উৎপন্ন দ্রব্য হইতে যে আয় তাহার কথাই ধরিতে হইবে। ৭টি শ্রেণী সম্বলিত একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সকল শিশুর উৎপন্ন সামগ্রিক দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বিদ্যালয়ের চল্‌তি খরচ উঠিবে। স্বাবলম্বনের উপর গান্ধীজী এতই জোর দিয়াছেন যে, তাঁহার মতে ৭ বৎসরে স্বাবলম্বী না হইলে বিদ্যালয়ের অধ্যয়নকাল আরও ২।১ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

স্বাবলম্বী শিক্ষার আরও কয়েকটা দিক আছে যাহা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। বর্তমান শিক্ষার প্রধান দোষ হইতেছে যে, ইহা আমাদের নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার ক্ষমতা দেয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর ছেলে এমন কি ছেলের অভিভাবকও জানেন না, ছেলে তাহার জীবনে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ছেলে I. Sc. পাশ করিয়া ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারীং ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে যাইবার চেষ্টা করে। সেখানে কৃতকার্য না হইলে B. Sc. পাশ করিয়া আইন পরীক্ষা দেয়। ২।৪ বৎসর আদালতে বাহির হইয়া সেখানে সুবিধা করিতে না পারিয়া শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করে। কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করিয়া সংসারের তাড়নায় হয়তো কোন জমিদারী সেরেস্তায় বা কোন সওদাগরী অফিসে চাকুরী লয়। ইহা হইতে কি বুঝা যায়? শিশু বা তাহার অভিভাবক কাহারও লক্ষ্য স্থির থাকে না। স্কুলে বা কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা দ্বারা সে নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াইতেও পারে না। বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ৭।৮ বৎসর শিশুকে এমন শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে প্রয়োজন হইলে সে অপরের উপর

নির্ভর না করিয়াই নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে। সূতা কাটা এবং কৃষিকার্যকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার প্রধান উদ্দেশ্য, শিশুকে অন্নবস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার উপযোগী করিয়া তোলা।

আমাদের ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনে স্বাবলম্বী করাও বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব, সংসার-সমুদ্রে তাহারা কতদূর নিরাশ্রয়। বাড়ীতে ঝি বা চাকর না থাকিলে আজকালকার যুবক-যুবতীরা চোখে অন্ধকার দেখে। বাড়ীতে ২ দিন মেথর বা ঝাড়ুদার না আসিলে বাড়ীর ময়লা বাড়ীতেই জমিয়া থাকে। রাঁধুনীঠাকুর না আসিলে বা বাড়ীর মেয়েদের অসুখ করিলে অনেক বাড়ীর পুরুষদের বাজার হইতে চিড়া, মুড়ি বা খাবার কিনিয়া খাইতে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য, বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে ছোটখাট স্বাভাবিক পরিবারের প্রতীক-রূপে গড়িয়া তোলা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আছে রান্নার কাজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ, বাসন মাজা, জল তোলা, পরিবেশন করা। এই সকল বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া সক্ষম, আত্মপ্রত্যয়শীল নাগরিক তৈয়ারী করা বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেকে যে-কোন কাজ দিলে তাহা আনন্দের সহিত করিবার জন্য সে আগাইয়া আসে। রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি সমস্ত কাজই সে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়াছে এবং বাস্তব জীবনে তাহা করিতে পশ্চাৎপদ নহে।

অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সূতাকাটা ও চাষের কাজ ছাড়া আর কোন হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয় না। যদি বুনিয়াদী শিক্ষা আবশ্যকীয়ভাবে লওয়া হয়, তাহা হইলে অন্যান্য শিল্প ও হাতের কাজ কোনরূপ উৎসাহ না পাইয়া দিন দিন অবনতির দিকে যাইবে এবং হয়তো কালে লোপ পাইয়া যাইবে। কিন্তু স্বাবলম্বনের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিসর কত ব্যাপক। শিশুকে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাকে অনেক বিষয়েই

শিক্ষা দিতে হইবে। কোন ছেলের চরকার একটা অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে কি তখন তাহার চরকা মাথায় করিয়া ছুতারবাড়ী ছুটিবে সারাইবার জন্য? ছোটখাট মেরামত করিবার মত শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেওয়া হইবে এবং সেজন্য কাঠের কাজ করিবার উপযুক্ত ২।১ প্রস্ত (set) যন্ত্রপাতি রাখিতে হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ডায়েরী লেখা, কাজের হিসাব রাখা, সামাজিক জীবনের রিপোর্ট লেখা ইত্যাদি বিষয়ে খাতার প্রয়োজন এবং পুরা এক বৎসরের হিসাব যাহাতে এক খাতায় থাকে সেইজন্য এই খাতাগুলি মোটা এবং শক্ত হওয়া উচিত। এখন প্রত্যেক শিশুকে বেশী দাম দিয়া মোটা বাঁধানো খাতা কিনিয়া দেওয়া কি সকল অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হইবে? তাহার পরিবর্তে শিশুকে কাগজ ও Card-board কিনিয়া দিয়া খাতা করিতে ও বাঁধাইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বাংলা দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্ররা সরস্বতী পূজা করিতে চাহে। তখন আমরা ছাত্রদের কুমারবাড়ী হইতে প্রতিমা কিনিয়া দিব, না শিশুদের প্রতিমা গড়িতে উৎসাহিত করিব? প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সাফাইয়ের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সাফাই কাজের জন্য বেত বা বাঁশের ঝুড়ির বিশেষ দরকার। এখন যতগুলি ঝুড়ির দরকার আমরা কি তাহা কিনিয়া লইব? আমার মনে হয়, বুনিয়াদী শিক্ষকের উচিত বাঁশ বা বেত যোগাড় করিয়া দিয়া শিশুদের ঝুড়ি তৈয়ারী করিতে শিক্ষা দেওয়া। এইরূপে স্বাবলম্বনের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সত্যিকার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানারকম হাতের কাজ শিখানো হইয়া থাকে।

আরও একদিক দিয়া দেখিলে বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বাবলম্বীকরণের শিক্ষা বলা যাইতে পারে। মহামতি গোখেল হইতে প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্‌ই বলিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন এবং আবশ্যিক করিতে হইবে। ধরিয়া লওয়া যাউক, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও আবশ্যিক হইল। কিন্তু তাহাতে দেশ কি খুব আগাইয়া যাইবে? যদি ভারতের সকল শিশুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারি শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ শেষ করে, তাহা

হইলেই কি তাহার সংসার-যাত্রার পাথেয় যোগাড় হইবে? প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু কতটুকুই বা শিক্ষালাভ করিবে এবং তাহার বাস্তব জীবনে কি কাজেই বা লাগে? সেইজন্য গান্ধীজী বলিলেন যে, প্রত্যেক নাগরিককে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহার জীবনের বুনিয়াদ শক্ত হইয়া গড়িয়া উঠে। যদি উচ্চতর শিক্ষা কাহারও ভাগ্যে না ঘটে, তাহা হইলেও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাত বৎসরে শিশু যাহা শিক্ষালাভ করিবে, তাহাতে জীবনে মোটামুটি সকল ক্ষেত্রেই সে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারিবে। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, খাদ্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বিষয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশু একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

আরও একদিক হইতে দেখিলে বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বাবলম্বী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হইতেছে, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতি মানুষের চরিত্রের তিনটি প্রধান দিক। চলতি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চিন্তাশক্তির দিকেই জোর দেওয়া হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কর্মজীবনে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। যাহারা শিল্প বিদ্যালয় বা Technical School-এ শিক্ষালাভ করে, তাহাদের বিশেষ বিশেষ দিকে কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু জ্ঞান ও অনুভূতির দিকটায় বিশেষ জোর দেওয়া হয় না। অঙ্কন বা সঙ্গীত বিদ্যালয় হইতে যে ছাত্র বাহির হইয়াছে তাহার অনুভূতির দিকটা বেশী বিকাশ লাভ করে কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের দিকটায় একটা শিথিলতা আসিয়া যায়। আমরা সামাজিক জীব; কিন্তু সমাজে বাস করিতে হইলে যে সমাজে কতকগুলি আইন-কানুন মানিতে হয়, সে বিষয়ে চলতি শিক্ষা-পদ্ধতি বিশেষ কিছু বলে না বলিলেই হয়। মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান খুব উচ্চে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় সকল দিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলেও বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বাবলম্বনের শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার* ফল

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল দিন দিন খারাপই হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসিবার পিছনে কত অর্থ এবং জীবনী-শক্তি ব্যয় হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে পরীক্ষার বিফলতায় জনসাধারণের অস্থির হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ এমনই নিরীহ এবং জীবনধারণের অন্যান্য সমস্যায় এমনই বিব্রত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল লইয়া কোন উচ্চ-বাচ্যই করে না। যাঁহারা শিক্ষাব্রতী এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কোন-না-কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিফলতার অনুপাত দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে কেন এবং কি করিলে ইহার গতিরোধ করা যাইবে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে পরীক্ষার খাতা দেখিয়া মনে হয় যে, আজকাল ছেলেরা বেশীর ভাগ পড়াশুনা করে না। পড়াশুনা করিবার সময়ই বা কোথায় আজকাল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার বহিয়া চলিয়াছে। রাজনৈতিক অভিধানে যতগুলি '-ism'-এর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার কোনটির ভক্তের অভাব হইবে না ছাত্র-সমাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার প্রধান কারণ ছাত্র-সমাজে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবাহ। রাজনীতি বুঝিতে হইলে শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হওয়া উচিত শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হইবার পূর্বে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝুঁকিয়া নিজের বিচার-বিবেচনার সহিত কাজ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে না—চিরকালই 'পরের মুখে ঝাল' খাইতে হইবে। কাজেই দেশের যে সকল নেতা ছাত্রদের রাজনীতিক্ষেত্রে

* বর্তমান নাম 'স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা' এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্য-শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক পরিচালিত।

নামাইবার জন্য প্ররোচনা দেন, তাঁহারা ছাত্র-সমাজের ও দেশের ক্ষতি করেন। স্বর্গীয়া শ্রীযুক্তা নাইডু কলিকাতায় প্রদত্ত তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রগতির সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা উচিত নহে। কিন্তু আজকাল নেতারা একথা ভুলিয়া যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইবার পূর্বেই ছাত্রদের রাজনীতিক্ষেত্রে নামিবার জন্য প্ররোচনা দেন।

ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হইবার জন্য অভিভাবকরাও কম দায়ী নহেন। অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই খোঁজ রাখেন না যে, তাঁহাদের ছেলেরা পড়াশুনা করিতেছে কিনা। বেশীর ভাগ অভিভাবকই মনে করেন, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করিয়া দিলে এবং মাসে মাসে নিয়মিত মাহিনা দিলেই তাঁহাদের সমস্ত দায়িত্ব শেষ হইয়া গেল। এমন অনেক অভিভাবকও আছেন যাঁহারা খবর পর্যন্ত রাখেন না যে, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা কোন্ শ্রেণীতে পড়ে। যদি পরীক্ষার ফল ভাল করিতে হয় এবং ফেলের অনুপাত কমাইতে হয়, তাহা হইলে অভিভাবকদের এ-বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া এবং একজন গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াই যে অভিভাবকরা সমস্ত দায়িত্ব শেষ করিবেন, তাহা চলিবে না। যে সকল অভিভাবকদের সময় এবং সামর্থ্য আছে তাঁহাদের উচিত, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা তত্ত্বাবধান করা। যাঁহারা সাংসারিক কাজে বা ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপারে খুব ব্যস্ত, তাঁহারা হয়তো নিজেরা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনাতে সাহায্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারা অন্ততঃ শিক্ষক মহাশয়দের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন যে, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা হইতেছে কিনা এবং তাহাদের পড়াশুনা ভাল হওয়ার জন্য কি করা উচিত।

পরীক্ষা পাশের অনুপাত দিন দিন কমিয়া যাওয়ার জন্য শিক্ষক মহাশয়রাও দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন না। শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন করেন গৃহ-শিক্ষকতা। সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রায় প্রত্যেক শিক্ষক মহাশয়ই

কয়েকটি ছাত্রকে পড়ান। বিদ্যালয়ের বাহিরে গৃহ-শিক্ষকতা করার ফ
শিক্ষক মহাশয়রা যখন বিদ্যালয়ে যান, তখন তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়েন এব
বিদ্যালয়ে থাকিবার সময়টিকেই তাঁহারা যতটা পারেন বিশ্রামের সময় হিসা
ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। ছেলেদের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা হউক বা ন
হউক সেদিকে শিক্ষক মহাশয়দের যতটা দৃষ্টি না থাকে, তাহার চেয়ে বে
দৃষ্টি থাকে যাহাতে বিদ্যালয়ের সময়টা কোন রকমে বিনা গোলযোগে কাটি
যায়। আবার অনেক সময়ে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্র
যখন কোন কারণে ধর্মঘট করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতে চাহে না, তখন শিক্ষ
মহাশয়রা একটু খুশীই হন এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন যে, অন্তত
একটা দিন তাঁহাদের চীৎকার করিতে হইবে না।

কিন্তু শিক্ষকদের এই অবস্থার জন্য সরকার এবং জনসাধারণই দায়ী
শিক্ষক মহাশয়দের যে পরিমাণ বেতন দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহাদের সংসা
প্রতিপালন হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন শিক্ষকদের যে বেতনের হা
নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পূর্বের অপেক্ষা ভাল হইলেও শিক্ষক মহাশয়দে
দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বি. এ. পা
শিক্ষকের বেতন ৬০৲ টাকা এবং এম. এ., বি. টি. শিক্ষকের বেতন ১২০
টাকা হইতে আরম্ভ হইবে। শিক্ষকরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাঁহাদে
সমাজে পাঁচজন লোকের মতই বাস করিতে হয় এবং ছেলেমেয়েদে
লেখাপড়া ও অন্যান্য সামাজিক কর্তব্যও পালন করিতে হয়। এইরূ
অবস্থায় ৬০।৭০৲ টাকা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে
অন্ন-সংস্থান, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এবং অন্যান্য সামাজিক কর্তব্য পাল
করিবার জন্য গৃহ-শিক্ষকতা করা ছাড়া শিক্ষক মহাশয়দের আর কো
উপায় থাকে না।

শিক্ষক মহাশয়দের অভাব-অভিযোগের জন্য জনসাধারণও কম দায়ী নহে
প্রায় সকল অভিভাবকই তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহ-শিক্ষক রাখেন

কিন্তু বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষক মহাশয়দের একটু স্বাচ্ছল্য আনিবার প্রস্তাব হইলেই ঘোর আপত্তি উঠে।

পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও ত্রুটি আছে। যে সকল পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের বেশীর ভাগই কলিকাতা বা অন্যান্য শহরের লোক। পরীক্ষকমণ্ডলীর সভায় খাতা দেখিবার যে সকল নির্দেশ ঠিক করা হয়, সেগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষক ছাড়া আর কোন শিক্ষকই কিছু জানিতে পারেন না। যদি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর এই নির্দেশগুলি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, তাহা হইলে শিক্ষক মহাশয়রা জানিতে পারেন, কোন্ প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাঁহারা ছাত্রদের সেইরূপ উপদেশ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারেন। পরীক্ষক হিসাবে আমি দেখিয়াছি, অনেক সময় একই রকম ভুল অনেক ছাত্রই করিয়া থাকে। যদি সকল পরীক্ষকের নিকট খাতা দেখার পর তাঁহাদের মতামত লইয়া যে সকল বিষয়ে বেশীর ভাগ পরীক্ষকই একমত, সেগুলি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং পরীক্ষায় ফেলের অনুপাতও দিন দিন কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। পরীক্ষায় ফেলের আরও একটি কারণ বলা যাইতে পারে, প্রশ্নপত্র করিবার রীতি। এখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার অধিকাংশ প্রশ্ন হয় ইংরাজীতে। অনেক ছেলে ইংরাজীতে লেখা প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে না বলিয়া জানা থাকা সত্ত্বেও উত্তর দিতে পারে না। মুষ্টিমেয় কয়েকটি হিন্দী ভাষাভাষী এবং ইঙ্গ-ভারতীয় ছাত্রের জন্য প্রশ্নপত্র ইংরাজীতে করার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্কুলের ফলাফল ভাল করিবার চেষ্টা সরকারের তরফ হইতেও করিতে হইবে। সরকারী পরিদর্শক-বিভাগ পরিবর্ধিত ও সংস্কৃত করিতে হইবে। এক-একটি জেলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নহে।

একজন জেলা-পরিদর্শকের পক্ষে সমস্ত স্কুল বৎসরে একবার পরিদর্শন করাও অনেক সময়ে সম্ভব হইয়া উঠে না। স্কুল পরিদর্শনে গিয়া পরিদর্শক মহাশয় সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের হিসাব-পত্র, বাড়ী-ঘর ও আসবাব-পত্রই বেশী লক্ষ্য করেন। শিক্ষক মহাশয়দের শিক্ষাদান-প্রণালী লক্ষ্য করিবার সময় প্রায়ই হইয়া উঠে না। পরিদর্শক মহাশয়ের উচিত ২।১ দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া সমস্ত শিক্ষকের পাঠদান-প্রণালীর দোষগুণ তাঁহাদের সহিত বসিয়া বিচার করা। ২।১টি শ্রেণীতে পাঠদান-প্রণালীর উন্নতিও বিধান করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, আমার ১৫ বৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় আমি ২।১ জন ছাড়া কোন পরিদর্শককে পাঠদান করিতে দেখি নাই। পরিদর্শক মহাশয়দের ভালভাবে পাঠদান করিবার ক্ষমতা আছে কিনা, সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর পরিদর্শক মহাশয়ের উচিত প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কাছে পরীক্ষার ফলাফল জানিতে চাওয়া। যে সকল স্কুলে পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হইবে, সেই সকল স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ে যাঁহারা পাঠদান করেন তাঁহাদের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে হইবে এবং বৎসরের পর বৎসর যদি কোন বিদ্যালয়ের ফল খারাপ হয়, তাহা হইলে সেই স্কুলে সরকারী সাহায্য কমাইতে এবং প্রয়োজনবোধে সাময়িকভাবে বন্ধ করিতে হইবে জেলা-পরিদর্শক মহাশয় যখন স্কুল পরিদর্শনে যান, তখন তাঁহার কর্তব্য হইবে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণের একটি সভা ডাকিয়া স্কুলের সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করিয়া স্কুলের উন্নতির জন্য কি করা যায়, তাহা স্থির করা। কিন্তু মোটা বেতনভোগী জেলা-পরিদর্শক মহাশয়ের পক্ষে সাধারণের সহিত মিলিয়া স্কুলের সমস্যা আলোচনা করিবার সময় ও ইচ্ছা দুইটিরই অভাব হইবে বলিয়া মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হওয়ার গুরুত্ব আমরা সব সময় অনুভব করি না। ১৯৫০ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শতকরা ৩৫ জন

পাশ করিয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৬৫ জন হইয়াছে ফেল। যাহারা ফেল হইয়াছে তাহারা পুনরায় এক বৎসর যদি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রতি ছেলেমেয়ের মাসে ৪৷৷॰ টাকা হারে মাহিনা বাবদ দেশের কত টাকা খরচ হইবে, তাহা আমরা কয়জন হিসাব করিয়া দেখি? ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে বর্তমান দুর্মূল্যের সময় অভিভাবকের উপর কত চাপ পড়িবে, তাহা আমাদের সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? যে বিরাট সংখ্যক ছেলে ফেল করিল, তাহাদের অনেকেই অর্থাভাবে পুনরায় পড়াশুনা করিতে পারিবে না। আমাদের দেশের শিক্ষাদান-প্রণালী এমনই সুন্দর যে, বিদ্যালয়ে থাকিবার সময় ছেলেরা এমন কিছু শিখে না যাহাতে তাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে। যাহারা ফেল করিল কিন্তু পুনরায় পড়িবার সুযোগ পাইল না, তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যবসায় ও বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারে। কিন্তু মোটা একটা সংখ্যা বেকার হইয়া থাকিবে এবং হয়তো রাষ্ট্র-বিরোধী আন্দোলনেও যোগদান করিবে। সরকারের এখন উচিত, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-বিভাগ ও শিক্ষাবিদ্‌দের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া যাহাতে পরীক্ষার ফল ভাল করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা এবং উপায় অবলম্বন করা।

উদ্বাস্তু-সমস্যা

বিদেশী শাসনের কবলমুক্ত হইয়া যখনই কোন দেশ স্বাধীন হয়, তখনই তাহাকে নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। স্বাধীন ভারতকেও অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। উদ্বাস্তু-সমস্যাই এখন ভারতের কাছে বিরাট রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে দলে দলে অ-মুসলমান জনগণ পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্বহারা হইয়া। ভারতবর্ষ হইতেও যে পাকিস্তানে লোকেরা যাইতেছে না বা পাকিস্তানে উদ্বাস্তু-সমস্যা নাই—আমি একথা বলিতেছি না। তবে ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের উদ্বাস্তু সমস্যা কিছুই নহে বলা যাইতে পারে। তবে একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৯০ জন আর পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইবেন না।

উদ্বাস্তু-সমস্যা তিন দিক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে :—

(১) পুনর্বসতি, (২) জীবিকা অর্জনের জন্য কর্ম-সংস্থান এবং (৩) উদ্বাস্তু শিশুদের শিক্ষা-ব্যবস্থা।

পুনর্বসতি

যাঁহারা বিভিন্ন Refugee Camp এবং শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের অবস্থা দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই রকমভাবে থাকা জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলদায়কও নহে কিংবা গৌরবজনকও নহে। বড় বড় শহরে ফুটপাথ, মোটর গ্যারেজ ইত্যাদি স্থানেও বহুলোক বাস করিতেছে। ভারতবর্ষের শহরগুলি এমনিতেই জনাকীর্ণ। তাহার মধ্যে উদ্বাস্তুদের ব্যবস্থা করিতে গেলে শহরের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

ভারতবর্ষের বহু পল্লী জনহীন হইয়াছে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধির ভয়ে সামর্থ্যযুক্ত পল্লীবাসীরা আপনাদের গৃহ ছাড়িয়া শহরে বাস করিতেছে। আমাদের দেশের নেতারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, পল্লীবহুল ভারতবর্ষে পল্লীর উন্নতি-সাধন করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে না। উদ্বাস্তু পুনর্বসতির ভিতর দিয়া পল্লী-উন্নয়নের একটা সুযোগ আসিয়াছে। যে সমস্ত পল্লী প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছে, সেখানকার পড়ো বাড়ীগুলির সত্বর সংস্কার করিয়া উদ্বাস্তুদের সেই সকল গ্রামে পাঠাইতে হইবে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। ভারতের পল্লীগুলি জনহীন হওয়ার একমাত্র কারণ ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপ। এই সকল গ্রামে উদ্বাস্তুদের পাঠাইবার সঙ্গেসঙ্গেই Anti-malarial Squad প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষণকারী দল গঠন করিয়া গ্রামগুলির স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই দেখা যায়, অনেক বিশাল জনহীন প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। এইগুলি চাষ বা অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। ইহার কারণ, হয়তো সেখানে নাই জলের ব্যবস্থা কিংবা যাতায়াতের সুবিধা। এই সকল জনহীন প্রান্তরে নলকূপ বা কূপ কাটিয়া জলের ব্যবস্থা করিয়া এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপন করা যাইতে পারে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ ও আমেরিকার সৈন্যদল ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিল। এই সকল ঘরবাড়ী নির্মাণ করা হইয়াছিল বহু ব্যয়ে। এই সকল ঘাঁটির কয়েকটি অবশ্য সরকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালরূপে ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের বেশীর ভাগই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং দিন দিন অব্যবহার্য হইয়া পড়িতেছে। এই সকল পরিত্যক্ত শিবিরগুলি সংস্কার করিয়া সেখানে বাস্তুহারাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সৈন্যেরা থাকিবার সময় এই সকল শিবিরে জল ও বিজলী বাতির ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তাও তৈয়ারী হইয়াছিল। কিছু অর্থব্যয়

করিয়া এই ব্যবস্থাগুলি পুনরায় চালু করিলে এগুলি ছোট ছোট শহরে পরিণত হইতে পারে। এই সকল পরিত্যক্ত শিবিরগুলিতে বাস্তহারাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিলে আর একটি সমস্যারও সমাধান হইতে পারে। যুদ্ধের সময় যখন শিবির প্রস্তুত হয়, তখন নিকটবর্তী গ্রামগুলি হইতে লোক সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া বিভিন্ন গ্রামে বসবাস আরম্ভ করে। যুদ্ধের পরে অনেকেই আর স্বগ্রামে ফিরিয়া আসে নাই। তাহার ফলে শিবিরগুলির নিকটস্থ জমির বেশীর ভাগই পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। শিবিরগুলিতে যদি উদ্বাস্তদের বসবাসের ব্যবস্থা করা যায় এবং এই পতিত জমিগুলি তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশের 'অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন কর' আন্দোলন কার্যে পরিণত করার দিকে অন্ততঃ খানিকটা অগ্রসর হওয়া যায়।

জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা

উদ্বাস্তদের মাথা গুঁজিবার স্থান দিলেই চলিবে না; তাহাদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। সরকারের পক্ষে বেশী দিন উদ্বাস্তদের অর্থ-সাহায্য করা সম্ভবও নয় এবং উচিতও নয়। উদ্বাস্তরা যাহাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা, ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা হিসাবে উদ্বাস্তদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

(১) কৃষক, (২) ধীবর, (৩) ব্যবসাদার, (৪) শিক্ষক, (৫) ডাক্তার, (৬) উকিল, (৭) শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক, এবং (৮) জমিহীন মজুর-শ্রেণী।

পশ্চিমবঙ্গে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে লোকের অভাবে বৎসরের পর বৎসর বহু জমি অনাবাদী রহিয়া যায়। কৃষি-বিভাগ হইতে এই সকল স্থানের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উদ্বাস্ত কৃষকদের সেখানে বসবাস করাইয়া পরিবারের

লোকসংখ্যা অনুপাতে জমি দিতে হইবে এবং চাষ করিবার জন্য বিনা সুদে বা অল্প সুদে টাকা ধার দিতে হইবে। এই সকল পতিত জমির মালিকরা জমি বিনামূল্যে দিতে আপত্তি করিতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকারকে জমির মালিকদের উদ্বাস্তু কৃষকদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ লইবার সর্তে জমি দিতে বাধ্য করিতে হইবে। আমাদের দেশে বর্তমানে খাদ্য-সঙ্কট, অথচ বহু জমি পতিত থাকিবে এবং অনেক উদ্বাস্তু কৃষক কর্মহীন অবস্থায় থাকিবে—তাহা কিছুতেই হইতে দেওয়া উচিত নহে। সরকারকে এ বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত কাজ করিতে হইবে।

বাঙালীর খাদ্য-তালিকায় মাছ একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। অথচ এই মাছ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানের দিকে চাহিয়া থাকে। সত্যই কি পশ্চিমবঙ্গ মাছ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারে না? আমার মনে হয়, সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর মাছের চাষ হইতে পারে। পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে নদীর সংখ্যা কম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নদীর সংখ্যা একেবারে কমও নহে। এই সকল নদীতে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা কি করা হইয়াছে? এই সকল নদীতীরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ধীবরদের বসাইয়া তাহাদের এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে মাছের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করিবার সময় লাইনের দুই ধারে মাটি খুঁড়িয়া গর্ত করা হইয়াছিল। এই সকল গর্ত রেলওয়ে লাইনের দুই দিকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়। সামান্য একটু খনন করিলে এই সকল গর্তে মাছ থাকিবার উপযুক্ত জল বারো মাসই থাকিতে পারে। রেলওয়ে লাইনের দুই দিকের গর্তগুলি পূর্ববঙ্গের ধীবরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া গর্তগুলি কাটাইয়া মাছ-চাষের এবং উদ্বাস্তু ধীবরদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা কি সরকার করিতে পারেন না? পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ছোট-বড় অনেক পুষ্করিণী আছে। ইহার অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে দিন দিন অব্যবহার্য হইয়া যাইতেছে। এই পুষ্করিণীগুলি সংস্কার করাইয়া ধীবরদের লীজ

দিলে পল্লীগ্রামে জলকষ্ট দূর হয়, মাছ-চাষের সুবিধা হয় এবং উদ্বাস্তু ধীবর জীবিকা অর্জন করিবার সুযোগ পায়।

বাংলা দেশের ব্যবসায় আজ অ-বাঙালীর হাতে গিয়াছে। ইহার জন্য বাঙালীর ব্যবসায়ের প্রতি অনাসক্তি ও অন্যান্য দেশীয় লোকদের ব্যবসায়-প্রীতি ও কুশলতাই দায়ী। অতীতে যাহা হইয়াছে হউক, এখন বাঙালী জাতিকে বাঁচিতে হইলে ব্যবসায় নিজের হাতে লইতে হইবে। পূর্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ছোট-বড় ব্যবসায়ী আছেন। তাঁহাদের উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য এবং বিনা বা অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে একটা বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। এই সকল ব্যবসায়ী কাছাকাছি বসিয়া যাহাতে অহেতুক প্রতিযোগিতা না করেন, সেইজন্য তাঁহাদের টাকা ধার দিবার এবং ব্যবসায় করিবার জন্য license দিবার সময় সরকারের সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গেই অধিক ছিল। বাংলা দেশ ভাগ হইবার পর বহু হিন্দু পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে অনেক বিদ্যালয়ই প্রায় অচল অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে এবং বহু শিক্ষক কর্মচ্যুত হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের অশান্ত এবং উদ্বেগপূর্ণ অবস্থার জন্যও অনেক শিক্ষক স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগের উচিত, উদ্বাস্তু শিক্ষকদের একটা তালিকা প্রস্তুত করা। পশ্চিমবঙ্গের সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করিতে হইবে যে, বিদ্যালয়ে কোন পদ খালি হইলে তাঁহারা যেন সরকারী তালিকাভুক্ত শিক্ষকদের নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। অবশ্য এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা শিক্ষক-পদপ্রার্থীদের কোন সুযোগ মিলিবে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের দাবী অগ্রাহ্য করিলে দেশে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। সেইজন্য শূন্য পদের অন্ততঃ অর্ধেক উদ্বাস্তু শিক্ষকদের জন্য রাখিলে যুক্তিযুক্ত হইবে।

বাংলা দেশে বহুলোক চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিকাতা ও শহর অঞ্চলে অনেক ডাক্তার দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাংলা তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র পল্লী-অঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইলেও একজন ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের উচিত, পল্লী-অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করিয়া অন্ততঃ প্রতি ৫টি গ্রামের জন্য একজন করিয়া ডাক্তারের ব্যবস্থা করা। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ডাক্তারদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সরকারকে অগ্রগামী হইতে হইবে।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদের মধ্যে অনেক উকিল আছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক আদালতে উকিলের সংখ্যা কম নহে। পশ্চিমবঙ্গের আদালতসমূহে যদি ইঁহারা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব হইতেই যাঁহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের সহিত অহেতুক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হইবে। এইজন্য আমার মনে হয়, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উকিলদের মধ্যে যাঁহাদের ওকালতি ছাড়া অন্যদিকে ক্ষমতা বা অনুরাগ আছে, তাঁহাদের ওকালতি ত্যাগ করিয়া সেই দিকে যাওয়া উচিত। তবে উকিলদের মধ্যে যাঁহারা অনেকদিন এই ব্যবসায় করিতেছেন এবং অন্যদিকে যাইবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা নাই, তাঁহাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদালতের অবস্থানুযায়ী যোগ দিবার অনুমতি দিতে হইবে।

শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের সমস্যাই দেশের সম্মুখে আজ বড় সমস্যা। এই কর্মক্ষম অবস্থায় তাহাদের কাজ দিতে না পারিলে তাহাদের শক্তি কুপথে চালিত হইতে পারে। ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবপন্থীদের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহার কারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর বেকার অবস্থা। সরকারের উচিত, নানারূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা নির্মাণ করিয়া শিক্ষিত যুবকদের সে সকল স্থানে নিযুক্ত রাখা। বাংলা দেশে ট্রাম-বাস পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের শতকরা ১৫ জন অ-বাঙালী। সরকারকে আইন করিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বাঙালী যুবকদের নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিতে হইবে। কলিকাতায় বহু ট্যাক্সি

চলে। এই সকল ট্যাক্সি-চালকদের আয় বেশ মোটারকম। অথচ দেখা যায় যে, এই ট্যাক্সি-চালকদের অধিকাংশই অন্য প্রদেশের লোক। ট্যাক্সি চালাইবার license দিবার সময় লক্ষ্য করিতে হইবে, বাঙালীর দাবী যেন অগ্রাহ্য না হয়। দেশের নেতা এবং সংবাদপত্র-সেবীদের এই সকল অধুনা-পরিত্যক্ত কার্য গ্রহণ করিবার জন্য শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবকদের উৎসাহিত করিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মোটা একটা অংশ জমিজমাহীন মজুর-শ্রেণীর লোক। ইহাদের জীবিকা অর্জনের কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? পশ্চিমবঙ্গকে মোটামুটি শিল্পপ্রধান অঞ্চল বলা যাইতে পারে। আমরা যদি বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এই সকল স্থানে হাজার হাজার কর্মী কাজ করিতেছে। কিন্তু তাহারা সকলেই প্রায় অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বাধ্য করিতে হইবে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে এই প্রদেশের লোক নিযুক্ত করিতে। অনেকেই একটা কথা বলিয়া থাকেন যে, বাঙালীরা অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের মত কর্মক্ষম নহে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এই ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন। বাংলা দেশের রেল-স্টেশনের কুলী, বাজারের মুটে, বাজারের দোকানদার, পুলিশ, কনস্টেবল বেশীর ভাগই অ-বাঙালী। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা জমিহীন মজুরদের এই সকল কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে।

উদ্বাস্তু শিক্ষা-সমস্যা

এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার বয়সোপযোগী শিশুর সংখ্যা অন্ততঃ ২ লক্ষের কম হইবে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ইহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে। অনেক স্থানে দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব হইতে যে সকল স্কুল ও কলেজ ছিল, সেই সকল বাড়ীতেই সকালে বা সন্ধ্যার সময় উদ্বাস্তু ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই ব্যবস্থা ঠিক নহে। যে

সকল শিশুরা তাহাদের বাপ-মা বা আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহাদের শিশু-মনে লাগিয়াছে একটা ভীষণ আঘাত। তাহারা সব সময় মনে করিতেছে যে, তাহারা ছন্নছাড়া, গৃহহারা। তাহাদের মন হইতে এই শঙ্কা ও অনিশ্চিতের ভাব দূর করিতে না পারিলে তাহারা কখনও সুস্থ নাগরিকে পরিণত হইবে না। অন্য বিদ্যালয়ের বাড়ীতে অস্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পড়িবার ব্যবস্থা করিলে শিশুদের মনে ছন্নছাড়া, গৃহহারা, পরাজিতের মনোভাব গভীর রেখাপাত করিবার সম্ভাবনাই বেশী। এইজন্য আমার মনে হয়, উদ্বাস্তু পরিবারদের স্থায়িভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ বিদ্যালয়ে এবং সাধারণ শিশুদের সহিত পড়াশুনা করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সমস্যা সমাধান করিবার পূর্বে শিক্ষা-ব্যবস্থা না করিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন বোধ করি। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, উদ্বাস্তু শিশুদের জন্য উদ্বাস্তু শিক্ষক নিযুক্ত করা হইতেছে। আমার মনে হয়, শিশুর মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে এই ব্যবস্থায় লাভ অপেক্ষা ক্ষতি হওয়াই সম্ভব। শিশুদের মন হইতে গৃহহারা অনিশ্চিতের ভাব দূর করিতে না পারিলে কখনই তাহারা স্বাভাবিক নাগরিক হইতে পারিবে না। কিন্তু সকল সময়ই যদি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন গৃহহারার দল তাহাদের শিক্ষক ও পরিচালকরূপে, তাহা হইলে শিশুরা কোনদিনও ভুলিতে পারিবে না যে তাহারা গৃহ হইতে বিতাড়িত অসহায় শিশু। এই কারণেই কেবলমাত্র উদ্বাস্তু শিশুদের জন্যও পৃথক বিদ্যালয় খোলার প্রয়োজন নাই। তাহার পরিবর্তে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বাড়াইয়া তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের এবং উদ্বাস্তু শিশু উভয়কেই ভর্তি করিতে হইবে।

লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পড়ায় এই প্রদেশে কর্ম-সংস্থানের সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও পাইবে। এখন যেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই সমস্যা সমাধান হইবার সম্ভাবনা নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার

মহাত্মা গান্ধী যখন বুনিয়াদী শিক্ষার কথা দেশবাসীর নিকট উত্থাপন করেন, তখন বিদেশী সরকার ইহা সুনজরে দেখেন নাই এবং তাহারই পাল্টা জবাব দিবার জন্য সার্জেন্ট কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস দল ক্ষমতালাভ করিয়াছে এবং সরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, শিশুদের সমাজের উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক তৈয়ারী করা। কাজেই যখনই কোন শিক্ষাবিদ্ কোন নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তখনই তাঁহার মনে একটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা উদয় হইয়াছে। সকল শিক্ষা-ব্যবস্থার পশ্চাতে থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের ছবি। শিক্ষা-পদ্ধতিকে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাহন বলা যাইতে পারে। মহাত্মাজী যখন বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি এক অভিনব সমাজ-ব্যবস্থার কথা ভাবিয়াছিলেন। মহাত্মাজী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সহযোগিতাপূর্ণ, অহিংস ও বিকেন্দ্রীত সমাজের। তিনি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন সেটি হইবে গণতান্ত্রিক ;—সেখানে থাকিবে সকলের সমান অধিকার, যন্ত্র-শিল্প অপেক্ষা কুটীর-শিল্পই পাইবে রাষ্ট্রের উৎসাহ। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা এই সমাজ ও রাষ্ট্র আদর্শের দিকে দেশ আগাইয়া যাইবে, ইহাই ছিল গান্ধীজীর বিশ্বাস।

আজ সারা ভারতবর্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজও প্রায় সকল প্রদেশে আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ কেমন হইতেছে, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রায় দুই বৎসর হইল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা সরকারীভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত বৈগাছিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুইটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই দুইটি কেন্দ্র হইতে গত বৎসর ১৩৪ জন ছাত্র ও ছাত্রী বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। এই ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৪২টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে কাজ কি রকম হইতেছে, তাহাই আমি যতটা জানিতে পারিয়াছি বর্ণনা করিব। এই বিদ্যালয়গুলির কয়েকটি মাত্র দেখিয়াছি। লোকমুখে এবং এই সকল বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট প্রাপ্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

১৯৪৮ সালে বৈগাছিতে যে সকল শিক্ষক বুনিয়াদী শিক্ষালাভ করিবার জন্য আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই আশা ছিল সরকারী চাকুরী পাইবে। তাহারা প্রথম ধাক্কা খাইল যখন সঠিক জানিতে পারিল যে, সরকারী চাকুরী তাহাদের হইবে না। District School Board-এর অধীনে অল্প বেতনে চাকুরী করিতে হইবে শুনিয়া অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িল। কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। সব সময় একথা সত্য কিনা জোর করিয়া বলা যায় না; কিন্তু বৈগাছি বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর উৎসাহ দমিয়া যায় সরকারী চাকুরী হইবে না এই সংবাদে। শিক্ষার সময় শেষ হইল, মহাত্মাজীর সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শের কথা অনেকেই শুনিল; কিন্তু যাইবার দিনে তাহাদের মুখে ছিল না হাসি এবং চোখে ছিল না দীপ্তি, যাহা প্রথমে শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করিবার দিন দেখা গিয়াছিল।

শিক্ষাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেরই মনে হইয়াছিল যে, বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষা-জগতে একটা নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে। শিক্ষালাভের পর তাহারা যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন জনসাধারণের নিকট পাইবে প্রচুর উৎসাহ, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যাইয়া অনেকেরই স্বপ্ন গেল টুটিয়া। আহার ও বাসস্থানই জীবনের কঠিনতম সমস্যা।

বুনিয়াদী শিক্ষার দীপ-শিখাধারী বাংলা দেশের প্রথম দল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে এই দুইটি সমস্যা দেখা দিল প্রবল আকারে। গ্রামের কোন কোন লোক দয়াপরবশ হইয়া খাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শিক্ষকদের ও দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু পরের গলগ্রহ হইয়া কি শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের কাজে মনোযোগ দিতে পারেন? তাহা ছাড়া যে যে বাড়ীতে বুনিয়াদী শিক্ষকদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই স্পষ্টভাবে শিক্ষকদের জানাইয়া দিয়াছেন যে, একজন লোককে খাইতে দিতে অনেক খরচ; অতএব খাওয়ার পরিবর্তে বাড়ীর ছেলেদের পড়াইতে হইবে। কর্মের মাধ্যমে সম্বন্ধিত প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবসর সময়ে রীতিমত পড়াশুনা করা দরকার এবং পরের দিন পাঠদানের জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুতি প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে দুই বেলা ছেলে পড়াইয়া যাহাদের অন্ন-সংস্থান করিতে হইবে, সেই সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাঠদানের কথা চিন্তা করিবার সময় কোথায়?

বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর আছে, যেমন—জেলা-পরিদর্শক ও সাব-ইনস্‌পেক্টর—তাঁহাদের অধিকাংশই বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞও নহেন এবং আস্থাবানও নহেন। তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পূর্ব-প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীই চলিতেছে। নূতনত্বের মধ্যে দেখা যাইতেছে—সূতা কাটার জন্য দৈনিক কিছু সময় দেওয়া হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন অস্তিত্বই নাই। সাধারণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগকে বুনিয়াদীতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার ফলে একই পরিবেশে মামুলী শিক্ষা-পদ্ধতি ও নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি চলিতেছে। পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির মিতালি কতটা সম্ভব, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই কল্পনা করিতে পারিবেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-গৃহে বুনিয়াদী বিদ্যালয় অবস্থিত আছে—এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের বাৎসরিক

পারিতোষিক বিতরণী সভায় আমার যাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দেখিলাম, অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে আছে—সূত্রযজ্ঞ। ১০।১৫টি ছেলেকে ১৫ মিনিট সূতা-কাটার পর বলা হইল যে, ইহাদের মধ্যে ভাল সূতা কাটিয়াছে এমন তিনটি ছেলেকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। একই নিশ্বাসে সূত্রযজ্ঞ এবং সূতাকাটার প্রতিযোগিতা, মামুলী বিদ্যালয় এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয় পাশাপাশি থাকার ফল।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির একটি প্রধান কথা—প্রতিযোগিতা অর্জনের চেষ্টা। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে সর্ত সরকার কর্তৃক আরোপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতিযোগিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং গ্রামে গ্রামে দলাদলির সৃষ্টি হইবার আশঙ্কাই বেশী। আমার মনে হয় সরকারের ইচ্ছা ছিল যে, গ্রামবাসীরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য কিছু কিছু দান করিলে বিদ্যালয়টি যে তাহাদেরই, এই মনোভাব জাগিবে। সেইজন্যই ৪০০০৲ টাকা ও ৬ বিঘা জমি দিবার সর্ত আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ ইহার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারে নাই। তাহার ফলে গ্রামে গ্রামে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। যে সকল গ্রামে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বা আগামী বৎসর স্থাপিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে, সেখানে টাকা ও জমি দিতেছেন গ্রামের কোন বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি এবং অনেক সময়ে বিদ্যালয়টি তাঁহার কোন আত্মীয়ের নামেই হইবে এই সর্ত থাকিতেছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের এই সর্ত (৪০০০৲ টাকা ও ৬ বিঘা জমি দান) প্রচলিত থাকিলে মহাত্মাজীর কল্পনা যে ভারতের প্রতি গ্রামে একটি করিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা, তাহা কোনদিনই সার্থক হইবে না। একজন লোকের কাছে ৪০০০৲ টাকা ও ৬ বিঘা জমি লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিলে শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন কি সম্ভব হইবে এবং গ্রামের জনসাধারণ কি বিদ্যালয়টিকে নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে?

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সূতাকাটা ও কৃষির মাধ্যমে শিক্ষাকে গ্রামের অশিক্ষিত অভিভাবকরা মোটেই ভাল চোখে দেখিতেছে না। তাহারা দেখে যে, সাধারণ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যায় একগোছা বই, খাতা, শ্লেট, পেন্সিল লইয়া, আর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু যায় তকৃলি, চরকা ইত্যাদি লইয়া। যখন তাহারা দেখে যে, বিদ্যালয়ে তাহাদের ছেলেরা সূতা কাটে, বাগানের কাজ করে, তখন তাহাদের মেজাজ বিগ্ড়াইয়া যায় এবং ছেলেদের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া মামুলী স্কুলে দেয়। এই প্রসঙ্গে কোন একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। কোন একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালাইবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে রাজী হন। এই বিদ্যালয়টি চালাইবার ভার লইলেন কোন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। বোধ হয় তাঁহার জন্যই এই বিদ্যালয়ে প্রথমে অনেক ছাত্র আসে। তারপর একটি একটি করিয়া ছাত্র কমিতে থাকে। ছাত্র কমিবার কারণ জানিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় অভিভাবকদের সহিত আলোচনা করেন। প্রায় সকলেই বলে, "আমাদের ছেলেদের চাষী ও তাঁতী করিয়া আপনারা নিজেরা চেয়ারে বসিয়া ছড়ি ঘুরাইবেন, তাহা চলিবে না। আমাদের ছেলেরা আপনাদের মতই চেয়ারে বসিতে পারে, এমন বিদ্যা শিখান।" বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়টি এক বৎসরের মধ্যেই উঠিয়া গেল, যদিও বিদ্যালয় পরিচালনা করিবার অর্থের অভাব হয় নাই। আমার মনে হয়, বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করিতে হইলে যেখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে তাহার সন্নিকটে মামুলী বিদ্যালয় উঠাইয়া দিতে হইবে এবং অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাইতে বাধ্য করিতে হইবে। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে অনেক লোক—এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী অনেক লোকও বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ। বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারে, সরকারকে তাহার জন্য প্রচার-কার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির কষ্টি-পাথর হইতেছে স্বাবলম্বন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সকল সময় স্বাবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ে উৎপাদনমূলক কাজের দিকে আত্ম-নিয়োগ করিবেন। আমি কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখিয়াছি এবং বেশীর ভাগ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংবাদ রাখি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় কোন বিদ্যালয়েই উৎপাদনমূলক কাজের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হইতেছে না। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ হইবে শিক্ষার বাহন। কাজের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষকদের যেরূপ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, আমাদের বর্তমান বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কার্যরত অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে তাহার অভাব আছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে আমি আর একটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছি। আমার মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামবাসী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার অভাব আছে। বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেকে মনে করেন, তাঁহারা নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের দ্বারা দেশের উপকার সাধন করিতে গিয়াছেন; অতএব গ্রামবাসীরা তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে। এদিকে গ্রামবাসীরা মনে করিতেছে, তাহারা ৪০০০৲ টাকা ও ৬ বিঘা জমি দিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা থাকিবেন তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞ। যতদিন গ্রামবাসী ও শিক্ষকদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা স্থাপিত না হইবে, ততদিন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইবার আশা কম।

সেবাগ্রাম হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা আশা দেবী কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা সরকারী সংস্থায় চলিবে না। মহাত্মাজী যে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সরকারীভাবে গ্রহণ করিবার সময় এখনও আসে নাই।

বয়স্কদের শিক্ষা

প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজ-শাসনে থাকিয়া ভারতবর্ষ দুই বৎসর স্বাধীন হইয়াছে। দীর্ঘ দিন ইংরাজের পক্ষপুটের মধ্যে থাকিয়া আমরা কি লাভ করিলাম, তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। শিক্ষা, সম্পদ, ধর্ম, সমাজ—এগুলির কোনদিকেই কি আমরা আগাইয়া গিয়াছি? কোন রকমে নিজের নাম সহি করিতে পারে, ইহাদেরও ধরিলে আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১২ জন মাত্র। যে ভারত একদিন ধন-সম্পদের জন্য বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আজ সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় হইয়াছে, ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গরীব দেশ কিনা? ধর্মের নাম দিয়া আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান ও বৌদ্ধ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে করিতেছি হানাহানি, রক্তারক্তি। সমাজ-ব্যবস্থাও আমাদের দোষত্রুটিপূর্ণ। বিশেষভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, এই সমস্ত সমস্যার পশ্চাতে আছে দেশে শিক্ষার অভাব, দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাগুলির সমাধান আপনি হইবে।

শিক্ষা-সমস্যার দিকে লক্ষ্য করিলে দুইটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষা ও পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, জনসাধারণ এ-বিষয়ে সচেতন এবং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের দুইটি পরিকল্পনা আজ দেশের সম্মুখে রহিয়াছে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশে কিছু কাজও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান অন্তরায় বয়স্কদের নিরক্ষরতা। নিশ্চয়ই পিতামাতা ও অভিভাবকরা শিক্ষার মর্যাদা বুঝে না বলিয়াই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারিটা শ্রেণীতে পাঠ শেষ করিবার পূর্বেই শতকরা ৮৫ জন শিশু বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেয়। আজ যে শিক্ষকের আর্থিক দুরবস্থা এবং সমাজে মর্যাদার

অভাব, তাহার জন্যও দায়ী বয়স্কদের শিক্ষাহীনতা। আজ দেশের চারিদিকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি দেখা দিয়াছে, তাহার কারণও ভাল করিয়া দেখিলে বয়স্কদের শিক্ষাহীনতাই বলা যাইতে পারে। ভারতে আজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে দেশে শতকরা ৮০ জনের বেশী লোক অজ্ঞ ও নিরক্ষর, সেদেশের গণতন্ত্রের কোন অর্থ হয় না। দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দেশের প্রতিটি লোকের রাষ্ট্র-পরিচালনা সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব কতটা আছে এবং তাহার কতটাই বা করার আছে, তাহা জানা দরকার। তাই দেখিতে পাই, আজ জাতীয় সরকার প্রতি প্রদেশে বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং এই বাবদে যাহা খরচ হইবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার অর্ধেক খরচ বহন করিতে রাজী হইয়াছেন। বয়স্কদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। এখন কথা হইতেছে, বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি রকম হইবে?

বয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনা করিতে হইলে এই সমস্যাটাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা দরকার :—

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, (২) সামাজিক শিক্ষা, (৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (৪) কৃষ্টি ও (৫) পরিচালন-ব্যবস্থা।

অক্ষর-জ্ঞান হইলেই অজ্ঞতা দূর হয় না ইহা সত্য, কিন্তু তবুও অক্ষর-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কয়েকটা বে-সরকারী মিশনারী প্রতিষ্ঠান এ-বিষয়ে পূর্ব হইতেই চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ আমার মনে হয়, যে প্রথায় বয়স্কদের অক্ষর-জ্ঞান শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা ঠিক নয়। সাধারণতঃ বয়স্কদের শিক্ষা দিবার জন্য নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পল্লীগ্রামে বয়স্ক ব্যক্তিরা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় ক্লান্তদেহে ঘরে ফিরে; সেই সময় তাহাদের নীরস অ, আ, ক, খ পড়িতে ভাল লাগিতে পারে না। Lewback-এর Key-word পদ্ধতিতে শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কর্মক্লান্ত বয়স্কদের

কিছুতেই তাহাতে আগ্রহ জন্মিতে পারে না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বয়স্ক লোকদের মন চায় একটু ফিকে আনন্দ ও গল্প-গুজব। পল্লীগ্রামের নিজ জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিতে তাহার ভাল লাগে। কাজেই বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করিতে হইলে মাস্টারি মনোভাব ত্যাগ করিয়া আনন্দদায়ক পরিবেশের ভিতর দিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। অক্ষর বা শব্দ-প্রথা অপেক্ষা বাক্য-পদ্ধতিতে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমার বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে বুঝাইতে হইলে দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সকল কৃষকই আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে—লক্ষ্য, কখন বৃষ্টি হইবে। এই সময় আবহাওয়ার Report হইতে উপযুক্ত ২।১ লাইন মুখোমুখি আলাপ-আলোচনা করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া উচিত। যদি গ্রামে বা গ্রামের নিকট কোন মেলা বা উৎসব থাকে, তাহা হইলে সেই উৎসব বা মেলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দুই-একটা বাক্যে সহজভাবে জিনিষটা বর্ণনা করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পল্লীগ্রামের লোকদের মধ্যে নানারকম ছড়া ও খনার বচন অনেকেই জানে এবং মুখে মুখে বলিতে পারে। এই ছড়াগুলি গ্রামবাসীদের অনেকেই লিখিতে বা পড়িতে পারে না। বোর্ডে লিখিয়া এই বাক্যগুলির সহিত বয়স্কদের পরিচিত করানো যাইতে পারে। আসল কথা, বয়স্কদের লিখিতে পড়িতে শিখাইবার পূর্বে আমাদের মনে থাকা উচিত যে, বয়স্করা সাধারণ সমস্ত কথা বলিতে ও বুঝিতে পারে—কেবলমাত্র তাহারা যাহা বলে বা শুনে তাহার লিখিত-রূপের সহিত তাহাদের পরিচিত করাইয়া দিতে হইবে।

অক্ষর-জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইতেছে বয়স্কদের সামাজিক শিক্ষা। মানুষ সামাজিক জীব। একা সে থাকিতে পারে না, কিন্তু সামাজিক শিক্ষা কি আমাদের আছে ? কয়েকজন লোক এক জায়গায় থাকিলে সমাজ গঠিত হয় না ; সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যান্য সকলের সুখ-সুবিধা দেখিবে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আজ

আমাদের গ্রামগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে কেন ? আমাদের মধ্যে সহযোগী মনোভাবের অভাব। আমরা শ্রমবিমুখ এবং নিজেদের ও সমাজের মঙ্গলা-মঙ্গল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বয়স্কদের শিক্ষার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য হইবে বয়স্কদের দায়িত্বশীল নাগরিক করিয়া তোলা। মানবতা বা সামাজিকতার দিক হইতে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির তুলনায় আমরা কত পশ্চাতে আছি, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিবার চেষ্টা করিব।

জাতিভেদ আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া হিন্দুদের মধ্যে একটা মূর্ত অভিশাপ বলা যাইতে পারে। গ্রামের মধ্যে ২০ ঘর লোক থাকিলে পাঁচটা দলের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়ীতে খায় না, বর্ণহিন্দু তপশীল শ্রেণীদের হাতে জল পর্যন্ত খাইতে চাহে না। যে দেশের কবি গাহিয়াছিলেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই,"—সেই মানুষে মানুষে ঘৃণা ও বিভেদ, ইহা কি কম দুঃখের কথা! জন্ম অপেক্ষা মানুষের কর্মকে আমরা কবে শ্রদ্ধা করিতে শিখিব জানি না। যাঁহারা বয়স্কদের শিক্ষার গুরুভার লইবেন তাঁহাদের দেখিতে হইবে, আমাদের সমাজের এই কলঙ্ক কি করিয়া দূর করা যায়। গ্রামবাসীদের জাতিভেদের তাৎপর্য এবং ইহার উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জাতিভেদ-প্রথা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের আর একটি জাতীয় সমস্যা হইয়াছে—সাফাই বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। আমরা বড়াই করি যে, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতায় আমাদের স্থান অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক উপরে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিব, আমাদের অহঙ্কার বৃথা। আমাদের দেশের লোকেরা স্নান সকলেই করে হয়তো; কিন্তু গ্রামের লোকেরা কি রকম জলে স্নান করে, তাহা কি আমরা লক্ষ্য করি ? যে পুকুরে লোকেরা স্নান করে, তাহারই এক ঘাটে গরু-মহিষের গা ধোয়ানো এবং আর এক ঘাটে সাবান ও সোডায় সিদ্ধ ময়লা কাপড়-চোপড় কাচা হয়। স্নান করিয়া কাপড় হয়তো রোজই আমরা বদ্‌লাই কিন্তু কাপড়খানা সত্যই পরিষ্কার কিনা লক্ষ্য করি কি ? যে পুষ্করিণীতে লোকে স্নান করে তাহারই জলে

মল-মূত্র ত্যাগের দৃষ্টান্ত পল্লীগ্রামে বিরল নহে। সামুদায়িক সাফাইয়ের দৃষ্টিতে বিচার করিলে আমাদের মত অপরিষ্কার জাতি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। আমরা বাড়ীর ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া প্রতিবেশীর বাড়ীর সম্মুখে জমা করিয়া রাখি। বাড়ীর ময়লা জল জমা হয় প্রতিবেশীর ঘরের নিকটে। আমরা আমাদেরই নিম্নশ্রেণীর এক প্রতিবেশী যতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হউক তাহার রান্না খাইতে রাজী নই; কিন্তু অন্য প্রদেশ হইতে আমদানি অপরিচিত একজন লোকের গলায় একটা সূতা থাকিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাকে রান্নাঘরের ভার দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না।

এখানে কয়েকটি সামাজিক গলদের কথামাত্র বলা হইল। এইরূপ আরও অনেক গলদ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে কলুষিত করিতেছে। শিক্ষার অভাবই এই সকল দোষ-ত্রুটির জন্য দায়ী। বয়স্কদের শিক্ষাদান-কার্যক্রমের একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, সামাজিক কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা।

গ্রামবহুল দেশ আমাদের এই ভারত। শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। ভারতে উন্নতি-সাধন করিতে হইলে গ্রামের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের প্রচার যতই হউক না কেন, কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষকে পূর্ণরূপে শিল্পপ্রধান করা সম্ভব নহে। শিল্পের প্রচার যতই হউক না কেন, বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে থাকিবে। গ্রামের উন্নতি করিতে হইলে বর্তমানে গ্রামের যে শোচনীয় অবস্থা, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সাধ্যে কুলাইলেই আজ লোকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে চায় কেন? ইহার প্রধান কারণ, গ্রামে থাকিয়া লোকের আজ অন্ন-সংস্থান হইতেছে না। চাষী তাহার চৌদ্দ-পুরুষ যে প্রথাতে চাষ করিত, সেই প্রথা অবলম্বন করাতে তাহার জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করার জন্য অন্য দেশের জমিতে তাহার অনেক বেশী পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া চাষী জানে না, কোন্ সময় কোথায় কোন্ জিনিষ বিক্রয় করিলে বেশী দাম পাওয়া যাইবে।

এইরূপে চাষী তাহার উৎপন্ন জিনিষের উপযুক্ত মূল্য পায় না—লাভ যাহা কিছু করিবার তাহা দালালই পাইয়া থাকে। গ্রামগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে কুটীর-শিল্পের প্রসারের দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। ভারত একদিন নানারকম কুটীর-শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আজ কুটীর-শিল্প ধ্বংসোন্মুখ। প্রথমতঃ—আমাদের রুচি হইয়াছে বিকৃত। আমরা হাতে তৈয়ারী টেকসই দামী জিনিষের চেয়ে কলে তৈয়ারী সস্তা ঠুন্‌কো জিনিষ বেশী গ্রহণ করি। দ্বিতীয়তঃ—আমাদের দেশের কারিগরেরা পুরাতন যন্ত্রপাতি দ্বারা মামুলী জিনিষই তৈয়ারী করে। নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারও জানে না এবং নূতন design-এর জিনিষ তৈয়ারী করিবার কল্পনাও তাহাদের মাথায় খেলে না। বয়স্ক-শিক্ষা পরিচালকদের একটা প্রধান কর্তব্য হইবে, আমাদের দেশের অজ্ঞ অধিবাসীর নিকট দেশ-বিদেশের চাষ-আবাদ ও শিল্পের খবর পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং যাহাতে গ্রামবাসীরা গ্রামে থাকিয়াই ভালভাবে তাহাদের জীবিকা অর্জন করিতে পারে তাহার পথ দেখাইয়া দেওয়া।

মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যেমন আহারের প্রয়োজন আছে, তেমনি জীবনে আমোদ-প্রমোদেরও স্থান আছে। আমাদের গ্রামে যে আজ শুধু পুষ্টিকর আহারেরই অভাব হইয়াছে তাহা নহে, নির্মল আনন্দেরও অভাব হইয়াছে।

বিদেশ হইতে আমদানি সস্তা বায়স্কোপের ছবি ও গান আমাদের দেশের চিরন্তন সংস্কৃতির টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে। কথকতা, কবির গান, রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ আজ কোথায় গেল? আমরা শৈশব অবস্থায় যে সমস্ত বিখ্যাত যাত্রার দলের নাম শুনিয়াছি, আজ সে-সব কোথায় গেল? যাত্রার দলে অভিনয় করিবার জন্য ভাল লোক নাই। যাত্রার ভাল বই নাই এবং বিশেষ করিয়া যাত্রার শ্রোতা নাই। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। যাত্রা, কবির গান, পাঁচালীর গান ইত্যাদিকে সুরুচিসম্পন্ন ও মনোগ্রাহী করিয়া গ্রামে গ্রামে আবার চালু করিতে হইবে।

বয়স্কদের শিক্ষা-প্রচেষ্টায় সাফল্য নির্ভর করিতেছে পরিচালন-ব্যবস্থা এবং

পরিচালকদের মনোভাবের উপর। এই কাজের জন্য সকলেই উপযুক্ত নহে। এই কাজের জন্য বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী— শিক্ষিত অশিক্ষিত সব-পাওয়া সব-হারাদের দুইটা দল রহিয়াছে। অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের প্রাচীর এই দুই দলকে পরস্পরের কাছ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বিভেদের এই প্রাচীর ভাঙ্গিতে না পারিলে বয়স্কদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যাঁহারা এই কাজের ভার লইবেন তাঁহাদের প্রথম কর্তব্য হইবে, গ্রামবাসীদের সহিত মিশিয়া যাওয়া। গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখ এবং গ্রামবাসীদের ভাল-মন্দের ভাগ লইয়া গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জন করিতে হইবে। আচার-ব্যবহারে এবং পোষাক-পরিচ্ছদে সাধারণের একজন না হইতে পারিলে গ্রামবাসীরা বাহিরের কর্মীকে তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতে পারিবে না। কথার দ্বারা শিক্ষা অপেক্ষা কাজের দ্বারা শিক্ষাই বড় কথা। যে সকল কর্মী বয়স্কদের শিক্ষার ভার লইবেন, তাঁহাদের এক-একটি কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়া সেখানে স্থায়িভাবে কিছুদিন থাকিতে হইবে। প্রথমেই গ্রামবাসীদের উপদেশ না দিয়া গ্রামবাসীদের যে সকল বিষয়ে ত্রুটি আছে, কর্মীরা নিজেদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্য দিয়া সেই সকল দোষ-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গ্রামের লোকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা প্রয়োজন নিজেরা যেখানে থাকিবেন তাহার চারিপার্শ্ব বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা। তাহা দেখিলে গ্রামের লোকেরাই নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে। বয়স্কদের শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হইতেছে শিশু। কাজেই বয়স্ক-শিক্ষার কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীর প্রধান কর্তব্য হইবে শিশু আরোগ্য-কেন্দ্র পরিচালনা করা, গ্রামের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিশুদের খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা। শিশুর মধ্য দিয়াই বয়স্কদের সহিত পরিচয়ের সূত্রটা স্থায়ী হইয়া উঠিবে। বাহিরের কর্মী ও গ্রামের অশিক্ষিত

বয়স্কদের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, শিশুই হইল তাহার সেতু। অজ্ঞ বয়স্কদের কাছে অজানাকে জানাইতে হইবে এবং দূরকে নিকট করিতে হইলে শুধু মুখের কথায়ই হইবে না, চোখে দেখার জিনিষও দরকার। সেইজন্য বয়স্ক-শিক্ষার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের Radio ও Magic-lantern-এর সাহায্যও লইতে হইবে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, মুহ্‌রম, ঈদ্‌ ইত্যাদি উৎসবে গ্রামবাসীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশী। এই সব উৎসব ও পূজা-পার্বণ এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে গ্রামের সকলেই যোগদান করিতে পারে। এই সকল উৎসব উপলক্ষে যাত্রা, কথকতা, কবির গান ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা উচিত। সম্ভবপর হইলে এই সময়ে ছোটখাট একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় এখনও মেলার রেওয়াজ আছে। এই সকল মেলায় অনেক দূর হইতে লোক আসে ও একত্রিত হয়। কিন্তু এই মেলা হইতে তাহারা লইয়া যায় ধূলোমাখা তেলে-ভাজা খাবারের সহিত অসুখের জীবাণু আর অকেজো ঠুন্‌কো কতকগুলি বিদেশী জিনিষ। এই মেলাগুলিকে নূতনভাবে পরিচালিত করিয়া বয়স্কদের একটা শিক্ষাস্থলে পরিণত করা যাইতে পারে। এই সময়ে Magic-lantern-এর ছবি, Radio-এর বক্তৃতা, প্রদর্শনী ইত্যাদির সাহায্যে বয়স্কদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

গত ১৫ই আগস্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার এই কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহাও এই গরীব দেশের পক্ষে যথেষ্টই বলিতে হইবে। সরকারের প্রচেষ্টার ফলাফলের গতি লক্ষ্য করিয়া আছে দেশের লোক। কিন্তু সরকারের এই শুভ প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে কর্মীদের মনোভাবের উপর। যদি কর্মীরা সেবার মনোভাব লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই বয়স্কদের শিক্ষার কাজ আগাইয়া যাইবে; কিন্তু চাকুরীর মনোভাব লইয়া এই কাজে যাঁহারা আগাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অর্থান্বেষণের বিভিন্ন পন্থা দেখা উচিত।

বুনিয়াদী শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি

মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার কথা দেশবাসীর নিকট প্রচার করেন ১৯৩৭ সালে। উৎপাদনমূলক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়া শিশুকে স্বাবলম্বী করিবার প্রয়াসই হইতেছে বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা গান্ধীজী জগতের সম্মুখে প্রথমে আনিয়াছেন, এ-কথা বলিতে অবশ্য পারা যায় না। কিন্তু উৎপাদনমূলক কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিবার কথা এবং শিক্ষার ভিতর দিয়া স্বাবলম্বী, শোষণহীন সমাজ গঠনের কথা গান্ধীজীই প্রথমে বলিয়াছেন। জগতে কোন ভাবধারাই হঠাৎ আসে না, তাহার পশ্চাতে থাকে একটি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। শিক্ষা-বিষয়ক কি কি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে সুদৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

গান্ধীজী নিজের শিক্ষা-জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, বিদ্যালয়ে তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন কর্মজীবনে তাহা বিশেষ কাজে লাগিল না। নিজে স্বীকার না করিলেও বলিতেই হইবে, গান্ধীজী বিদ্যালয়ে ভাল ছেলেই ছিলেন। কিন্তু ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য বিলাত গিয়া দেখিলেন যে, অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার শিক্ষা তিনি বিদ্যালয়ে পান নাই। বিদ্যালয়ে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া এমন কিছুই শেখেন নাই যাহা তাঁহাকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করিতে পারে। তখন হইতেই মহাত্মাজীর মনে হইল, বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির চাই আমূল পরিবর্তন। শিশুর জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন শিক্ষার মূল্য বড় বেশী দেওয়া যায় না—সত্যিকার শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া উঠিবে শিশুর সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে ভিত্তি করিয়া।

কর্ম উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া গান্ধীজীর মন গলিয়া গেল। ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গান্ধীজী আন্দোলন সুরু করিলেন। সে-সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল, তাহার বেশীর ভাগই পরিচালিত হইত ইউরোপীয়দের দ্বারা। তাহার ফলে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ স্থান পাইত না সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে। ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য একখানি সংবাদপত্র তিনি বাহির করিলেন। তারপর সংবাদপত্র ও ছাপাখানা লইয়া গিয়া Phœnik Colony স্থাপন করেন। গান্ধীজী ঠিক করেন, এই Phœnik Colony হইবে নূতন আদর্শে; এখানে সকল কর্মীই পাইবে সমান মর্যাদা। সংবাদপত্রের Editor হইতে Compositor পর্যন্ত সকলকেই সমান হারে মাসে ৩ পাউণ্ড হিসাবে বেতন দেওয়া হইবে। আমরা বলিতে পারি যে, এই Colonyতেই আরম্ভ হইল মহাত্মাজীর সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শোষণহীন সমাজের বাস্তব পরীক্ষা। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদী শিক্ষায় সমাজের যে রূপের চিত্র মহাত্মাজী সকলের সামনে ধরিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে Phœnik Colonyতে।

আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গান্ধীজী আরম্ভ করিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। দলে দলে ভারতীয়দের জেলে দেওয়া হইতে লাগিল। এখন সমস্যা দাঁড়াইল, যাহারা জেলে যাইতেছে তাহাদের পরিবারবর্গের প্রতিপালন লইয়া।

অনেক চিন্তা করিয়া গান্ধীজী Tolstoy Farm নামে একটি কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। স্থির হইল যে, এই Farm-এর অধিবাসীরা ছোট-বড় সকলেই কিছু-না-কিছু উৎপাদন করিবে এবং ইহাদের লক্ষ্য হইবে, Tolstoy Farmকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা। এই Farm-এর সকল কাজই অধিবাসীদের পালাক্রমে করিতে হইবে। আমার মনে হয়, সাম্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত স্বাবলম্বী সমাজ গঠন করিবার যে অভিজ্ঞতা গান্ধীজী Tolstoy Farm পরিচালনা করিবার সময় অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ভবিষ্যতের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আদর্শ সমাজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল।

Tolstoy Farm-এ গান্ধীজী শিক্ষাবিষয়ক আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অর্থের সন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক গিয়াছিল। Tolstoy Farm-এর অধিবাসীবৃন্দ ছিল নানা ভাষাভাষী। ইহাদের শিশুরাও ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী। এই সকল শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি করা যায়, ইহা হইল গান্ধীজীর সমস্যা। হিন্দী, উর্দু, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষক নিযুক্ত করা Tolstoy Farm-এর অধিবাসীদের ছিল সাধ্যাতীত। তাই গান্ধীজী শিশু-শিক্ষার এমন একটি মাধ্যমের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন যাহা সমভাবে সকল শিশুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেই সকল শিশুকেই একই সময় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাই গান্ধীজীর পরিচালনায় এখানে চামড়ার কাজ, চাষের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এইখানেই বলা যাইতে পারে, কর্মকেন্দ্রিক হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের গোড়াপত্তন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শেষ হইল। গান্ধীজী দেশে ফিরিলেন। মহামতি গোখেলের পরামর্শে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি আসিলেন শান্তি-নিকেতনে। কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত নূতন বিদ্যালয়ের রূপ দেখিয়া গান্ধীজী মুগ্ধ হইলেন। সাধারণ ছেলেদের অন্য কোন ক্ষমতাই বিকাশ লাভ করে না। তাই গান্ধীজী সকলকে আহ্বান করিলেন—'ছেড়ে এস তোমরা গোলামখানা, তোমরা মানুষ হও।' গান্ধীজীর ডাকে দলে দলে ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়া আসিল গোলামখানা হইতে। National School এবং National College-এ ছেলেমেয়েরা দলে দলে ভর্তি হইল। National School এবং College-এ চরকা কাটা ছাড়া বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। সাধারণ স্কুল এবং কলেজ

হইতে দোকানে ও আফিসে picketing করা, রাজনৈতিক procession-এর দল ভারি করা ছাড়া দেশের অন্য কোন কাজ এই সব ছেলেমেয়েরা করিবার সুযোগ পায় নাই। তাই মনের খোরাক না পাইয়া অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা ফিরাইয়া লইয়া গেল তাহাদিগকে সেই পুরাতন গোলামখানায়। ইহাতে সূক্ষ্মদর্শী গান্ধীজীর চোখ এড়াইল না যে, সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাবেই National College ও Schoolগুলি অল্পদিনেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন হইতেই, আমার মনে হয়, গান্ধীজী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, চরকা কাটার মধ্যে শিক্ষণীয় সম্ভাবনা কি আছে, তাহা দেখিয়া কাজে লাগাইতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার ঠিক পূর্বগামী এবং অগ্রদূত বলা যাইতে পারে মধ্য-প্রদেশের বিদ্যামন্দির পরিকল্পনাকে। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বিদ্যালয়কে গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীনভাবে কল্পনা করা হয় নাই। বিদ্যামন্দিরকে গ্রামের প্রাণকেন্দ্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শিক্ষক হইবেন গ্রামের নেতা, সব কাজেই থাকিবে শিক্ষকের হাত। বিদ্যালয়কে ছোটখাট সমাজ মনে করিতে হইবে। কৃষি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি যে সকল বিষয় শিখিলে সুখে জীবন যাপন করা যাইবে তাহাই শিখানো হইবে। কিন্তু বিদ্যামন্দির পরিকল্পনায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বীজ নিহিত থাকিলেও ইহা স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করা হয় নাই। বিদ্যালয়ে শিল্প কয়টি থাকিবে এবং শিল্পের মাধ্যমে কি, কেমন করিয়া এবং কতটুকু শিক্ষা দেওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। গান্ধীজীর সহকর্মী শ্রীরবিশঙ্কর শুক্ল মহাশয় ইহার মূলে আছেন। ইহার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মহাত্মাজী উৎপাদনমূলক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হইবার শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা দেশবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষা অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন ভারতে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে। এই আলোকের সন্ধান গান্ধীজী হঠাৎ পান নাই—ইহার পশ্চাতে আছে তাঁহার ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিক্‌নিক্

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শিশুদের কাছে বিদ্যালয় আকর্ষণীয় নহে। খুব কম ছেলেই আছে যাহারা স্কুলের সময় হইলে আনন্দের সহিত স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বাপ, মা ও অন্যান্য অভিভাবকদের তাড়নায় এবং শিক্ষক মহাশয়ের বেতের ভয়ে ছেলেরা অনিচ্ছাসত্ত্বে খেলা ছাড়িয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ছুটির পর ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলের বাহিরে আসে, তখন তাহাদের আনন্দোদ্ভাসিত মুখ দেখিলে মনে হয়, তাহারা সদ্য জেলখানা হইতে মুক্ত কয়েদী অপেক্ষাও সুখী। পৃথিবীর সকল শিক্ষাবিদ্‌ই আজ স্বীকার করেন যে, স্কুলকে গড়িয়া তুলিতে হইবে আনন্দ-নিকেতন। আমাদের দেশের স্কুলগুলির পরিবেশের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, স্কুলে শিশুদের আকর্ষণ করিবার মত কিছুই নাই। তাই স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতেই আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা এবং সরকার চেষ্টা করিতেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে এবং আমাদের দেশের স্কুলগুলিকে অন্যান্য দেশের মত নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে। আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, বিদ্যালয়ে ছেলেদের মগজে পাঠ্য-পুস্তকের কতকগুলি তথ্য জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেই চলিবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকিবে নানারকম আনন্দ-দায়ক কাজ। এই সকল কাজ হইবে এমনই যাহা শিশু স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত করিতে থাকিবে এবং আনন্দময় কাজের মাধ্যমেই হইবে শিশুর শিক্ষা। চঞ্চল শিশু কোন বিষয়ে বেশী সময় মনোযোগ দিতে পারে না; স্কুলের কর্মসূচী একঘেয়ে হইলে শিশুর ভাল লাগে না এবং অনিচ্ছায় করা কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানও সার্থক হয় না। শিক্ষক মহাশয়কে শিশুদের লক্ষ্য

করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে থাকে অভিনবতা। বিদ্যালয়ের দিনগুলি সুখময় করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়রা বৎসরে ২।১ বার পিকনিকের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শিশুর স্বভাব এমনই যে তাহাকে কিছু করিতে বাধ্য করা হইতেছে জানিলেই তাহার মনে জাগে বিতৃষ্ণা এবং সাধারণভাবে সে কাজ যতই আনন্দের হউক, শিশুর মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ করিতে চাহে। তাই পিকনিক্ যদি শিশুদের আনন্দ বর্ধন করিবার জন্য হয়, তাহা হইলে ইহার সমুদয় কর্তৃত্ব শিশুদের উপরেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। শিশুদের উপরে কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিবার অর্থে আমি একথা বলিতেছি না যে, শিক্ষক মহাশয় সেখানে থাকিবেন না। বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষক মহাশয় পিকনিকের সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং সকল সময়ই উপস্থিত থাকিবেন; কিন্তু এমনভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে শিশুরা মনে করিতে পারে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাহাদের। শিক্ষক মহাশয় পিকনিক্ করা হইবে এবং কবে ও কোথায়, তাহা নিজে শিশুদের কাছে তাঁহার আদেশ বলিয়া জাহির করিবেন না। পিকনিকের প্রস্তাব তিনি ছেলেদের কাছে করিতে পারেন কিন্তু পিকনিক্ হইবে কিনা এবং কোন্ দিন হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার শিশুদের উপরই দিতে হইবে। শিশু-চরিত্রের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই জানেন যে, বিদ্যালয়ে বদ্ধঘরের মধ্যে থাকিতে শিশুরা এমনই অপছন্দ করে যে, পিকনিকের কথা শুনিলেই তাহাদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। পিকনিক্ করা সাব্যস্ত হইলে এবং পিকনিকের দিন স্থির হইলে শিশুদের মধ্য হইতে শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ-মত কয়েকটি কার্য-নির্বাহক সমিতি শিশুরা নির্বাচন করিবে। যথা ঃ—

(১) পরিকল্পনা সমিতি; (২) স্থান-নির্বাচন সমিতি; (৩) সরবরাহ সমিতি; (৪) অগ্রগামী দল; (৫) রন্ধন-কার্যের দল; (৬) পরিবেশন-কার্যের দল; (৭) সাফাই কার্যের দল; (৮) আনন্দ-পরিবেশ সমিতি; (৯) কোষাধ্যক্ষ এবং (১০) হিসাব-রক্ষক ইত্যাদি।

সমিতি গঠন করিবার সময় শিক্ষক মহাশয় মনে রাখিবেন যে, একটি শিশু যোগ্যতার হিসাবে একাধিক সমিতিতে থাকিতে পারে কিন্তু কোন শিশুরই নাম যেন বাদ না পড়ে। প্রত্যেক শিশুকেই কোন-না-কোন সমিতিতে থাকিতে দিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকেই মনে করিতে পারে তাহার কিছু-না-কিছু কর্তৃত্ব আছে।

পরিকল্পনা সমিতি—এই সমিতির সকল সভ্য একত্রে মিলিত হইয়া ঠিক করিবে পিক্‌নিক্ কখন হইবে এবং উহার কার্যক্রম কি হইবে, সকল ছেলে যদি যোগদান করে তাহা হইলে কত খরচ হইবে এবং মাথা-পিছু কত চাঁদা দিতে হইবে ; খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আর কি কি জিনিষ কার্য-তালিকাভুক্ত হইবে। পরিকল্পনা সমিতি কার্য-তালিকা স্থির করিয়া সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেরা সেই কার্য-তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। কার্য-তালিকা স্থির হইয়া গেলে চাঁদা আদায় করিবার ভার লইতে হইবে হিসাব-রক্ষক ও কোষাধ্যক্ষকে। পিক্‌নিকের কার্য-তালিকা প্রস্তুত হইলেই পরিচালনা সমিতির কাজ শেষ হইবে না। তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা, কার্যক্ষেত্রে পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন হইলে তাহা নিজেদের দায়িত্বে করিতে হইবে। পিক্‌নিক্ শেষ হইলে সকল ছেলে বিদ্যালয়ে না ফেরা পর্যন্ত পরিকল্পনা সমিতির কাজ শেষ হইবে না।

স্থান-নির্বাচন সমিতি—শিক্ষক মহাশয়ের সহিত বসিয়া স্থির করিবে, পিক্‌নিকের জন্য স্থান নির্বাচন করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। জায়গাটি বিদ্যালয় হইতে একটু দূরে হওয়া উচিত। তাহা না হইলে পিক্‌নিকের আনন্দ কমিয়া যায়। পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নির্দিষ্ট স্থানের নিকট গ্রাম বা আশ্রয় স্থান থাকা উচিত; কারণ হঠাৎ ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইলে শিশুরা আশ্রয় লইতে পারিবে। স্থান-নির্বাচন করিবার সময় আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে

হইবে। বিদ্যালয়টি যে পরিবেশে অবস্থিত পিক্‌নিকের স্থানটি তাহা হইতে যেন অন্য রকম হয়। নিকটে কোন পাহাড়, পর্বত, ঝর্ণা, নদী বা বাগান থাকিলে সেই স্থানে পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করা ভাল। স্থান-নির্বাচন সমিতি বিভিন্ন স্থান দেখিয়া এবং শিক্ষক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থান ঠিক করিয়া শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের সকলের সম্মুখে তাহার বর্ণনা করিবে এবং কোন্ দিকে যাইতে হইবে ও যাইতে কত সময় লাগিবে ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের মতামত জানাইবে। স্থান-নির্বাচন সমিতির আরও একটা কাজ থাকিবে। পিক্‌নিকের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাইবার পথে কতকগুলি বিশ্রাম-স্থান ঠিক করিয়া বিশেষ কোন চিহ্ন দিতে হইবে। পিক্‌নিকের দিনে শিশুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হইবে। যাহাতে কোন দল খুব পিছনে না পড়ে বা পথ ভুলিয়া না যায়, তাহার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের বাঁশী বা অন্য কোন সঙ্কেত-সূচক শব্দে সকল ছেলে বিশ্রাম-স্থানে একত্রিত হইবে এবং শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশ পাইলে পুনরায় অগ্রসর হইবে ভিন্ন ভিন্ন দলে। বিশ্রাম-স্থানের সংখ্যা যেন খুব বেশী না হয়; কারণ তাহাতে শিশুদের বিরক্তি আসিতে পারে।

সরবরাহ সমিতি—এই সমিতির সভ্যগণ মিলিত হইয়া স্থির করিবে পিক্‌নিকের জন্য কি কি জিনিষের দরকার হইবে এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ বিনা খরচে যোগাড় করিতে পারা যায়। যে-সব জিনিষ যোগাড় করিতে পারা যায় কাহারা উহাদের কি কি যোগাড় করিবে এবং কি রকমভাবে যোগাড় করা হইবে, তাহা ঠিক করিতে হইবে। বাজার হইতে যে সকল জিনিষ কিনিতে হইবে, তাহার পরিমাপ ও দাম নির্ণয় করিতে হইবে। যে সকল জিনিষ কিনিতে হইবে তাহার মোট দাম সকল ছেলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে জন প্রতি কত চাঁদা পড়িবে, তাহা এই সমিতিকে ঠিক করিতে হইবে। পিক্‌নিকের স্থানে জিনিষগুলি লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও এই সমিতিকে স্থির করিতে হইবে। পিক্‌নিকের শেষে যাহাতে সকল জিনিষ ফিরিয়া আসে,

তাহার ব্যবস্থাও এই সমিতির কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইবে। এই সমিতিকে সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সবচেয়ে কম খরচে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কি করিয়া যোগাড় করা যায়।

অগ্রগামী দল—পিকৃনিকের নির্দিষ্ট দিনে সকল ছেলে একই সঙ্গে যাইয়া স্থান পরিষ্কার ও রন্ধনের যোগাড় করিতে থাকিলে পিকৃনিক্ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম। এইজন্য একটি অগ্রগামী দল নির্বাচিত করিতে হইবে। তাহারা খুব প্রত্যূষে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র লইয়া পিকৃনিকের স্থানে উপস্থিত হইবে। এই দলের সহিত সাফাই ও রন্ধন দলও থাকিবে। আমাদের জাতীয় জীবনে প্রধান দোষ, আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে সজাগ নহি। আমরা পিকৃনিক্ করিতে যাই কিন্তু যে স্থানে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করি, তাহার চারিদিক পরিষ্কার করি না। পিকৃনিক্ শেষ হইলে আমরা স্থান ত্যাগ করি জায়গাটি পরিষ্কার না করিয়াই। সাফাই দলের কাজ হইবে রন্ধন-কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে স্থানটি পরিষ্কার করা এবং পিকৃনিক্ শেষ হইলে স্থানটি পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসা। রন্ধন-কার্যের দলকে শুধু গতানুগতিক-ভাবে খাবার জিনিষ তৈয়ারী করিলেই চলিবে না। কতজন ছেলে খাইবে, জন-পিছু কত চাল, ডাল, তরকারি লইতে হইবে, তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। ভাত রান্না হইলে কত সের চাল রান্না করিতে কত সের জল দিতে হইবে, কত সের তরকারির জন্য কতটা তেল, নুন ও মশলা দিতে হইবে ইত্যাদির হিসাব সঠিক রাখিতে হইবে।

রন্ধন শেষ হইলে রন্ধন-দলের কাজ শেষ হইবে এবং তারপরই আরম্ভ হইবে পরিবেশন-দলের কাজ। আমাদের দেশে এই পরিবেশন-কাজটি কোন দিনই সুশৃঙ্খলভাবে হয় না। বাড়ীর খোঁজ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, পুরুষদের খাওয়াইয়া মেয়েরা যখন খাইতে বসে, তখন তাহাদের ভাগ্যে অনেক সময় তরকারি জোটে না এবং ভাতের সঙ্গে মুড়ি বা চিড়া মিশাইয়া ক্ষুধা মিটাইতে হয়। কোন বড় রকম উৎসব বা ভোজের বাড়ীতে লক্ষ্য

করিলে দেখা যায়, প্রথম ২।৪ দলের থালা বা পাতায় অনেক খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় এবং শেষের দল যখন খাইতে বসে, তখন অনেক জিনিষই কম পড়ে। সেজন্য পরিবেশন-দলের কাজ যাহাদের উপর পড়িবে, তাহাদের বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। প্রথম দেখিতে হইবে, সর্বশুদ্ধ কত জন খাইবে এবং যে পরিমাণ খাদ্য আছে, তাহাতে প্রত্যেককে কতটা পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক দলের মতই পরিবেশন-দলের জন্য থাকিবে একজন দলপতি। সে ঠিক করিয়া দিবে, কে কোন্ জিনিষ পরিবেশন করিবে ও কোন্ দিকে কে কোন্ জিনিষ পরিবেশন করিবে এবং কোন্ দিক হইতে আরম্ভ করিবে। প্রথম বারে সকলকে কম অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিতে হইবে। সকল জিনিষ পরিবেশন হওয়ার পর দলের নেতার নির্দেশমত খাওয়া আরম্ভ হইবে। পরিবেশনের নেতার কাজ হইবে চারিদিকে লক্ষ্য রাখা কাহার কোন্ জিনিষ দরকার এবং বিভিন্ন জিনিষ পরিবেশনকারীদের সেইরূপ নির্দেশ দেওয়া। যখন দেখা যাইতেছে, কোন্ খাদ্যদ্রব্য আর পরিবেশন করিলে অন্যান্য দলের কম পড়িতে পারে, তখন সে কথা সকলকে জানাইয়া দিতে হইবে। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই দলের দায়িত্ব শেষ হইবে না।

পিক্‌নিকের অর্থ শুধু খাওয়াই নহে। বাড়ীতে সকল ছেলেই খায়—কেহ হয়তো খারাপ, কেহ হয়তো ভাল। একটি দিন একটি বিদ্যালয়ের সমস্ত ছেলে কি করিয়া সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আনন্দের সহিত কাটাইতে পারে, তাহার জন্যই পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পিক্‌নিক্ খাওয়া-দাওয়াতেই শেষ না হয়। খাওয়ার শেষে খেলাধূলা, গান-বাজনা, হাস্য-কৌতুকের ব্যবস্থা করার ভার থাকিবে **আনন্দ পরিবেশ সমিতির** উপর। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই অনেক রকম আনন্দ দানের ক্ষমতা থাকে। অনেক সময় লজ্জায় তাহা স্কুলে প্রকাশ করিতে পারে না। এই সমিতির কাজ হইবে কোন্ কোন্ ছেলের গান-বাজনা,

হাস্য, কৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা আছে, তাহা খোঁজ লইয়া যাহাতে তাহারা সকলের সম্মুখে নিজেদের বিদ্যার পরিচয় দেয়, তাহার ব্যবস্থা করা। যেখানে পিক্‌নিক্ হইবে তাহার নিকটে কোন লোকালয় থাকিলে সেখানকার লোকজনকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করা উচিত। হয়তো দেখা যাইবে, গ্রামের লোকেদের মধ্যে অনেকে গান-বাজনা করিয়া শিশুদের আনন্দ দান করিতে পারিবে; সেই গ্রামের শিশুরাও যদি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র হয়, তাহা হইলে গ্রামের লোকেরা শিক্ষক মহাশয় এবং অন্যান্য শিশুদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইবে।

কোষাধ্যক্ষ এবং হিসাব-রক্ষক দুইজনে মিলিয়া ছেলেদের কাছে চাঁদা আদায় করিবে। টাকা থাকিবে কোষাধ্যক্ষের কাছে। সরবরাহ সমিতি মারফৎ সমস্ত খরচ হইবে। কত টাকা কোন্ সময় কাহাকে দেওয়া হইতেছে, হিসাব-রক্ষক তাহার হিসাব রাখিবে। যাহাকে টাকা দেওয়া হইতেছে, তাহার নিকট হইতে রসিদ লইতে হইবে এবং যে কাজে খরচ হইতেছে, সম্ভব হইলে তাহার cash memo লইতে হইবে। কোষাধ্যক্ষ একখানি খাতা রাখিবে—তাহাতে একদিকে আদায়ের হিসাব এবং আর একদিকে থাকিবে খরচের হিসাব। যখনই হিসাব-রক্ষককে কোন টাকা দেওয়া হইবে, তখনই তাহার নিকট হইতে রসিদ বা খাতার পাশে সহি করিয়া লইতে হইবে। পিক্‌নিক্ শেষ হইলে তাহার পরদিন সকল ছেলেদের মিলিত সভায় হিসাব-রক্ষক এবং কোষাধ্যক্ষ মিলিয়া একটা রিপোর্ট দিবেন। তাহাতে কত টাকা আদায় হইয়াছে—কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার বর্ণনা থাকিবে। যদি হাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহা কিভাবে খরচ হইবে এবং টাকা কম পড়িলে তাহা তুলিবার ব্যবস্থাই বা কি হইবে, সে বিষয়ে সকলের মতামত লইতে হইবে।

পিক্‌নিক্ হইয়া যাওয়ার দুই-এক দিনের মধ্যেই শিক্ষক মহাশয়দের উপস্থিতিতে ছেলেদের একটা সভা ডাকিতে হইবে। এই সভায় পিক্‌নিক্ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। প্রত্যেক সমিতির নেতা তাহার দলের কাজের

বিবরণী পাঠ করিবে। অন্যান্য ছেলেরা এই বিবরণী এবং কার্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিবে। সমগ্রভাবে পিক্‌নিক্ সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে। কোথায় দোষ-ত্রুটি হইয়াছে—কেমন করিয়া ইহা আরও সুশৃঙ্খলার সহিত পালন করা যাইত, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। পিক্‌নিকের সময় শিক্ষক মহাশয়রা নীরবে সব দেখিবেন—ছেলেরা মারাত্মক রকম ভুল না করিলে তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সভাতে তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবেন। কোথায় দোষ-ত্রুটি হইয়াছে, কি করিলে তাহা দূর করা যাইতে পারে, কোন্ দলের কাজ বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে, কোন্ দল কাজ বিশেষ মনোযোগের সহিত করে নাই—ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়রা আলোচনা করিবেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বিদ্যালয়ে পিক্‌নিকের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? ছেলেদের নিছক আনন্দ দান ছাড়া পিক্‌নিকের শিক্ষণীয় সম্ভাবনীয়তা আছে কতটুকু? কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার পদ্ধতি আজ পৃথিবীর সকল দেশ মানিয়া লইয়াছে; ভারত সরকারও বুনিয়াদী বা কর্ম-মাধ্যমে শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ ইহাই নহে যে, শিশুকে সকল সময় উৎপাদনমূলক কাজ করাইতে হইবে। শিশুকে পাঠ্য-পুস্তকের পাঠের মধ্যেই আবদ্ধ না রাখিয়া বিদ্যালয়ে নানারকম কার্যসূচীর প্রবর্তন করিতে হইবে, যাহার মধ্যে শিশু পাইবে আনন্দ এবং শিক্ষাও আনন্দের মধ্যে ও অনেক সময় শিশুর অজ্ঞাতেই হইয়া যাইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে পিক্‌নিকের মূল্য অনেক। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য উপযুক্ত নাগরিক তৈয়ারী করা। দায়িত্বজ্ঞান ও আত্ম-নির্ভরশীলতাই নাগরিকের প্রধান গুণ। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া শিশুদের এই দুইটি গুণ যাহাতে বিকাশ পায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত পিক্‌নিকের আয়োজন করিয়া; তাহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ছাত্রদলের হাতে ছাড়িয়া দিলে তাহারা নিজ দায়িত্বে কাজ করিতে শিখিবে। হিন্দুদের মধ্যে আজ একতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং ছোঁয়াছুঁয়ি ইহার প্রধান কারণ। পিক্‌নিকের সময় বিদ্যালয়ের সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর

শিশু একত্রে মিলিত হইয়া একত্রে খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ পাইবে। আমাদের দেশে শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে যেন তাহারা একই পরিবারভুক্ত। যদি বিদ্যালয়ের কাজ ১০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত পড়াশুনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। পিক্‌নিকের সময় শিক্ষক ও ছাত্র পরস্পরের কাছে আসিবার সুযোগ পায়। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে একটু সতর্ক করিয়া দিতে চাই। কোন জিনিষই ঘন ঘন হইলে তাহার আনন্দ নষ্ট হইয়া যায়; তাহা ছাড়া একটা পিক্‌নিক্ করিতে কিছু খরচও আছে। সেইজন্য বৎসরের মধ্যে দুই-এক বারের বেশী পিক্‌নিক্ হওয়া উচিত নহে।

উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষা

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ছুটির তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবিবার বাদ দিয়া বৎসরের মধ্যে তিন মাসের উপর থাকে ছুটি। আবার ছুটির উপলক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হইতেছে কোন-না-কোন উৎসব—সামাজিক বা ধর্ম-বিষয়ক। বিদ্যালয়ে ছুটি দিবার প্রথা যখন প্রবর্তিত হইয়াছিল, তখন উৎসবের জন্য কেন যে ছুটি দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বিদ্যালয়ে ছুটির প্রয়োজন আছে—ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষ হইতে। বিদ্যালয়ে দিনের পর দিন শিশুদের মগজে যে বিভিন্ন বিষয়ে নানারূপ তথ্য প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা দানা বাঁধিবার জন্য বা ইংরাজীতে যাহাকে বলে Consolidate করিবার জন্য অবশ্য একটা সময় চাই এবং শিশুদের পক্ষ হইতে ছুটির প্রয়োজন এইজন্যই। শিক্ষকেরও ছুটির প্রয়োজন নিজের কর্মক্লান্ত জীবনকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য।

কিন্তু উৎসবের জন্য বিদ্যালয়ের ছুটি দিবার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশে বিভিন্ন সমাজে ধর্ম উৎসবগুলি যেভাবে পালিত হয়, তাহাতে শিশুদের করণীয় কিছু আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আমাদের দেশের যে-কোন বিদ্যালয়ে দেখা যাইবে নানা জাতি, সমাজ ও ধর্মাবলম্বী শিশুদের সমাবেশ। বিভিন্ন জাতি এবং সমাজের ধর্ম ও সামাজিক উৎসবে ছুটি দিতে গেলেই ছুটির তালিকা যায় বাড়িয়া। একটা অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকায় নানারকম ধর্ম উৎসবের নাম থাকে বটে, কিন্তু ছাত্ররা এমন কি অনেক শিক্ষক মহাশয়ও বিভিন্ন ধর্ম উৎসবের তাৎপর্য ভালভাবে বুঝেন না। যদি বিশেষভাবে সন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, শিশুরা এই ছুটির দিনগুলি কাটায় খেলাধূলা ও গল্প-গুজব

করিয়া এবং শিক্ষক মহাশয়রা কাটান আলস্যে। এই সম্বন্ধে আর একটা কথাও ভাবিবার আছে। মাঝে মাঝে ২।১ দিন ছুট্‌কোছাট্‌কা ছুটিতে না হয় শিশুদের সত্যিকার উপকার—না আসে ইহা শিক্ষকদের কোন কাজে।

উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছুটি না দিয়া বিদ্যালয়ে উৎসবগুলি উদ্‌যাপন করিবার ব্যবস্থা করিলে আমরা শিশুদের বৈচিত্র্যবিহীন বিদ্যালয়-জীবনকে আনন্দময় করিতে পারি এবং উৎসবগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়া শিশুদের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধিও করিতে পারি। উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া শিশুর শিক্ষা কিরূপ আগাইয়া যাইতে পারে, তাহাই এই প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিব।

বিদ্যালয়ে পালনীয় উৎসবগুলিকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—

(১) ধর্মোৎসব—দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, মহরম, গুডফ্রাইডে ইত্যাদি।

(২) সামাজিক উৎসব—নবান্ন, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদি।

(৩) ঋতু-উৎসব—বসন্তোৎসব, বর্ষা-মঙ্গল, পয়লা বৈশাখ ইত্যাদি।

(৪) মহাপুরুষ দিবস।

(৫) রাষ্ট্রনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস—২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগস্ট ইত্যাদি।

(৬) শিক্ষায়তনের স্মরণীয় দিবস—বিদ্যালয় স্থাপন-দিবস, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন-দিবস, প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলন দিবস ইত্যাদি।

বৎসরের প্রথমেই শিক্ষক মহাশয়দের একত্রে বসিয়া স্থির করা উচিত, কোন্ কোন্ উৎসব বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপন করা হইবে। বিদ্যালয়ে পালনযোগ্য উৎসবগুলির তালিকা এমন স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখা দরকার যাহাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। উৎসবের তালিকা করিবার সময় আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজের উৎসব যেন তালিকায় স্থান পায়।

কোন্ প্রকার উৎসব কিভাবে পালন করিলে শিশুরা আনন্দ পাইবে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাও লাভ করিবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাউক ঃ—

(১) **ধর্মোৎসব**—আমাদের দেশে ধর্মের নামে যত অনর্থ হইয়াছে আর কোন কিছুর দোহাই দিয়া তদ্রূপ হয় নাই। ধর্মের প্রকৃত তথ্যের দিক দিয়া আলোচনা করিলে সকল ধর্মের মধ্যেই মিল পাওয়া যায়। বিরোধ আরম্ভ হয় ধর্মের ব্যবহারিক এবং আনুষ্ঠানিক দিক লইয়া। পরধর্মের তথ্যগুলির সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ধর্ম-বিদ্বেষের কারণ। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত করিবার জন্যই বিদ্যালয়ে ধর্মোৎসব পালন করা উচিত। ভারতবর্ষের প্রধান ধর্মগুলির বিশেষ বিশেষ দিনগুলি উদ্‌যাপন করিতে হইবে। যে উৎসবটি পালন করা হইবে তাহার তাৎপর্য কি, তাহা শিশুদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে শিশুদের প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি পাঠ করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। যে দিবসটি বিদ্যালয়ে পালন করা হইবে, তাহার ব্যবহারিক ও আনুষ্ঠানিক দিকের যে অংশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আঘাত লাগিতে পারে, তাহা ত্যাগ করা উচিত। শিক্ষক মহাশয়দের পরিচালনায় যে-কোন ধর্মোৎসব এমনভাবে উদ্‌যাপন করিতে হইবে, যাহাতে সকল ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েরা যোগ দিতে পারে। এই উৎসব বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া শিশুদের অভিভাবক ও গ্রামের লোকদের যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

(২) **সামাজিক উৎসব**—আমাদের দেশে বার মাসে তের পার্বণ প্রচলিত ছিল এবং এখনও পল্লীগ্রামে আছে। এই সকল পার্বণের প্রধান লক্ষ্যই ছিল, গ্রামের বিভিন্ন লোকের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আমরা এই সকল সামাজিক বর্বরতা মনে করিয়া বর্জন করিতে চলিয়াছিলাম। এখন আবার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এই উৎসবগুলির দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। নবান্ন, পিঠে সংক্রান্তি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি সামাজিক উৎসবগুলি বিদ্যালয়ে শিশুদের লইয়া উদ্‌যাপন করিতে হইবে। এই সকল উৎসবে খাওয়া-দাওয়াটাই প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক শিশুর সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ

করিয়া বিদ্যালয়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিতে হইবে। রান্না এবং পরিবেশন করিতে গিয়া শিশুরা শিখিবে সহযোগিতার মর্যাদা। পল্লীগ্রামে খাওয়া-দাওয়া লইয়াই জাতিভেদের গণ্ডী সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয়ে এই সকল সামাজিক উৎসব পালন উপলক্ষে সকল শ্রেণীর শিশুদের একসঙ্গে রান্না, পরিবেশন ও খাওয়া প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথার বন্ধন শিথিল করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রীতির বীজ রোপণ করিবে। এই সকল উৎসব সম্বন্ধে আমাদের দেশের কবিদের লেখা অনেক কবিতা ও গল্প আছে। সেই সকল কবিতা ও গল্প শিশুদের আবৃত্তি ও আলোচনা করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। শিশুরা বেশীর ভাগই এক গ্রামের হইলেও কেহ কেহ অন্য জায়গায় এই উৎসবটি কেমন করিয়া উদ্‌যাপিত হয়, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকিতে পারে। শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন গ্রামে বা জেলায় গিয়াছেন। শিক্ষক ও ছাত্ররা বিভিন্ন গ্রাম বা জেলায় এই উৎসবগুলি কিরূপভাবে পালিত হয়, তাহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিবেন। ইহাতে শিশুদের মনের ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা বাড়িবে এবং দেশের বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে। সামাজিক উৎসবগুলি পালন উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে নানা রকম আমোদ-প্রমোদের প্রচলন দেখা যায়। এই সমস্ত আমোদ-প্রমোদ অশ্লীলতাবর্জিতভাবে ও বিশুদ্ধ আকারে বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে প্রচলন করা যাইতে পারে।

(৩) ঋতু-উৎসব—অন্যান্য দেশে ছয়টি ঋতু পুস্তকের পৃষ্ঠায় বর্তমান। কিন্তু প্রকৃতির দান এই বাংলা দেশে ছয়টি ঋতুর অস্তিত্ব বেশ অনুভব করা যায়। এই ছয়টি ঋতুই বাঙালীদের প্রাণে ছোঁয়া দিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার অন্যান্য বিশিষ্ট কবিরা এই ঋতুগুলি সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। বিদ্যালয়ে এই ঋতু-উৎসবগুলি পালন করা উচিত। এই সকল উৎসবে এই ঋতুর উপযোগী গান, কবিতা প্রভৃতি শিশুদের দ্বারা গাওয়ানো ও আবৃত্তি করানো যাইতে পারে। এই সকল ঋতুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া নাটক রচনা

করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলে শিশুদের মনে ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন ছাপ দিবে, তেমনি ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান বিনা চেষ্টায় অনেকটা আগাইয়া যাইবে।

(৪) **মহাপুরুষ দিবস**—মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পালন করা উচিত। ঐ দিবসগুলিতে মহাপুরুষদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে ছেলেদের উৎসাহিত করা উচিত। মহাপুরুষদের জন্মস্থান, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি ম্যাপের সাহায্যে শিশুদের দেখাইলে তাহারা আনন্দ পাইবে এবং দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিতে পারিবে। মহাপুরুষদের বাণী হইতে সার্বজনীন বিভেদহীন অংশগুলি বাছিয়া শিশুদের মধ্যে যাহাদের হাতের লেখা ভাল তাহাদের দ্বারা লিখাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গানো উচিত। মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি ও তাঁহাদের বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রের ছবি শিক্ষক মহাশয় শিশুদের সাহায্যে আঁকিবার চেষ্টা করিবেন। মহাপুরুষদের জন্ম, কর্ম ও বাণী দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিশুদের বয়স ও বোধশক্তির অনুযায়ী করিয়া তাহাদের কাছে সাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(৫) **রাষ্ট্রনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস**—প্রত্যেক জাতির কতকগুলি দিবস চিরস্মরণীয় হইয়া আছে ও থাকিবে। ঐ সকল দিবসে এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইয়াছে যাহা জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে রাখা উচিত। ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগস্ট, ৪ঠা জুন, ৩১শে জানুয়ারী প্রভৃতি দিবস ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিদ্যালয়ে এই সকল দিবস পালন করিতে হইবে এবং তাহাদের তাৎপর্য শিশুদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় দিবসগুলি কেন চিরস্মরণীয় হইয়াছে, কোন্ বৎসর প্রথম সেই ঘটনাটি হয় এবং ঐ দিনে প্রধান প্রধান নেতা কে কে ছিলেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য শিশুদের সুযোগ দিতে হইবে। দেশের ম্যাপ আঁকিয়া সেই ঘটনাস্থলগুলি দেখাইয়া দিলে শিশুদের মনে জায়গাগুলি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট

ধারণা জন্মিবে। বিশিষ্ট দিনগুলির প্রধান প্রধান নেতাদের ছবি আঁকিবার জন্য এবং তাঁহাদের বাণী সঙ্কলন করিবার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করা উচিত।

(৬) বিদ্যালয়ে স্মরণীয় দিবস—অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে শিক্ষায়তনগুলির একটা অভাব সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে। প্রত্যেক দেশে বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের বিদ্যালয়ের প্রতি একটা মমত্ববোধ থাকে। জীবনে যত বড় প্রতিষ্ঠাই কেহ লাভ করুন না কেন, তাঁহাদের প্রাক্তন বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রতি থাকে একটা প্রবল আকর্ষণ। বিদ্যালয়ের ভাল-মন্দের দিকে থাকে ছাত্রের একটা আন্তরিক টান। ইহার কারণ অন্যান্য দেশে বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গান, বিশিষ্ট পোষাক ও কতকগুলি দিবস পালন করিয়া শিক্ষক মহাশয়রা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ব জাগাইবার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশেও বিদ্যালয়-স্থাপন দিবস, প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলন দিবস, বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন দিবস প্রভৃতি প্রচলন করা উচিত। এই সকল দিবসের মাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষক, বর্তমান ছাত্র ও শিক্ষক, বর্তমান ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগসূত্র ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হইবে। এই সকল দিবসে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ছোটখাট একটি Exhibition বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই প্রদর্শনীতে দেখানো হইবে শিশুদের হাতের কাজ। বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিষ্কারভাবে বড় বড় করিয়া লিখিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা জীবনের বিভিন্ন দিকে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ছবি ও তাঁহাদের কীর্তি-কলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের বিশেষ পোষাক সকল ছাত্র ও শিক্ষক এই দিন যাহাতে পরিয়া আসেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সকল দিবসে পৌরোহিত্য করিবার জন্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদেরই আহ্বান করা উচিত।

উপরে কয়েক প্রকার উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। এখন উৎসব-পালন সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই-এক কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বিদ্যালয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করিবার পরিকল্পনা শিশুদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শিশুদের মধ্যে কয়েকটি Sub-Committee গঠন করিয়া বিভিন্ন কাজের ভার তাহাদেরই উপর দিতে হইবে। ইহাতে শিশুদের মধ্যে জাগরিত হইবে দায়িত্বজ্ঞান এবং পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব। বিভিন্ন উৎসব পরিচালনা করিবার ভার বিভিন্ন ছাত্রের হাতে থাকিলে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব লইবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেক উৎসবে বিদ্যালয় সাজাইবার সময় লক্ষ্য করিতে হইবে যাহাতে নূতনত্ব থাকে। অল্প খরচ বা বিনা খরচে এবং গ্রামে বা বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায়, এইরূপ জিনিষ লইয়া বিদ্যালয়-গৃহ সাজাইবার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করিতে হইবে। বিদ্যালয় সাজানো, পরিকল্পনা প্রস্তুত—ইহার ভিতর দিয়া শিশুদের যাহাতে রুচি-বোধ হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক উৎসব শেষ হইবার দুই-এক দিনের মধ্যেই শিক্ষকমণ্ডলী বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। উৎসবটি উদ্‌যাপনে কোথায় দোষ-ত্রুটি হইয়াছে এবং কি করিলেই বা এই দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা যাইবে—এই সকল বিষয় শিশুদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা উচিত। ইহাতে শিশুদের বিচার-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। উৎসব-পালন বিষয়ে একটা সতর্কবাণী মনে করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। উৎসব উদ্‌যাপন করিতে হইবে বলিয়া বিদ্যালয়ে উৎসবের সংখ্যা খুব বেশী যেন না হয়। কারণ তাহাতে শিশুদের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। যখন কোন উৎসব উদ্‌যাপন করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে, তখন দেখিতে হইবে যে কত বেশী সংখ্যক শিশুদের আমরা ইহার মধ্যে অংশ দিতে পারি। একটা উৎসবে যাহারা বাদ পড়িল, অন্য উৎসবে তাহাদের সুযোগ দান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উৎসবগুলি উদ্‌যাপন করিবার ইচ্ছা যেন শিশুদের মধ্যেই জাগরিত হয়। শিশুরা যেন মনে না করে যে, উৎসবগুলি পালন করিবার দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়ের উপর জোর করিয়া চাপানো হইতেছে।

১৯৪৭-এর পরে বাংলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা

প্রায় দুই শত বৎসর ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাস মোটেই গৌরবের নহে। লিখিতে ও পড়িতে পারে এইরকম লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে শতকরা ১০ জন মাত্র। শিক্ষা-প্রসারের কথা যখনই উঠিয়াছে, তখনই বিদেশী সরকার অর্থের অভাব এই অজুহাতে তাহা ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ছিল না নাড়ীর টান—তাই এদেশের লোক লিখিতে পড়িতে শিখুক আর না শিখুক, সে বিষয়ে সরকারের মাথা-ব্যথা ছিল না। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ইংরাজ সরকার যাহা করিয়াছেন, তাহা কেবল বিশ্বের কাছে কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য এবং শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখিবার কাজে সহকারী তৈয়ারী করিবার জন্য। কিন্তু এখন আমাদের দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়াছে—সুদিন আসিয়াছে। আজ আমাদের দেশ স্বাধীন—আমাদেরই প্রতিনিধি শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন। দেশের লোক অশিক্ষিত থাকিলে বিদেশের কাছে আজ আর আমাদের কৈফিয়ৎ দিবার কিছু থাকিবে না। তাই আমাদের জাতীয় সরকার শিক্ষা-বিস্তারের দিকে মন দিয়াছেন। তিন বৎসর মাত্র আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। একটা জাতির জীবনে তিন বৎসর খুব বড় কথা নহে। তবু এই তিন বৎসরে আমাদের জাতীয় সরকার শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

সকল সভ্যদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং আবশ্যিক। চলতি শতাব্দীর প্রথম দিকে মহামতি গোখেল ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলকভাবে চালু করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৯৩০ সালের মধ্যে সকল প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রদেশেই

এই আইন সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হয় নাই। স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস সরকার প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির দিকে মন দিয়াছেন। চল্‌তি শিক্ষা-পদ্ধতি যে ত্রুটিপূর্ণ, সে বিষয়ে তর্কের কোন প্রয়োজন নাই। এই বাবদে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার মোটা অংশই যে অপচয় হয়, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। তাই সরকার শিক্ষার এই প্রথম ধাপটার উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। শিশুদের জন্য কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত সরকার কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিকেই চালু করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করিতে হইলে চাই শিক্ষক। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশেই শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বাংলা দেশে ১৯৩৮ সালে প্রথম দুইটি শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়; তাহার পর বর্তমান বৎসরে আরও ৫টি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার ১৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদান করিতে হইলে প্রত্যেক জেলাতে অন্ততঃ একটি করিয়া শিক্ষাকেন্দ্র খোলা উচিত। এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, যে শিক্ষকদের দ্বারা আমরা বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করিতে যাইতেছি, তাঁহারা উপযুক্ত কিনা। কর্মের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষকদের যে রকম বিদ্যা, বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসা থাকা উচিত, তাহা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আছে কি? বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে এবং যে সকল বুনিয়াদী শিক্ষকের সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বর্তমানে যে সকল শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করিতে যাইলে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

স্বাধীন ভারতে নূতন শাসন-পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া হইতেছে তাহারা যদি

অজ্ঞ ও নিরক্ষর হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বার্থান্বেষী লোকেদের হাতের পুতুল হইবে এবং স্বাধীনভাবে ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়াও জনগণের নিরক্ষরতার অন্যদিকও আছে। দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা কোন বিষয়েই উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের শতকরা ৮৫ জন থাকে নিরক্ষর। সেইজন্য বয়স্কদের শিক্ষাকেই জাতি-গঠনের প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। বৃটিশ আমলে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই বলিলেই চলে। কংগ্রেস সরকার জাতি-গঠনের এই দিকটার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। সকল প্রদেশেই জনশিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে। বাংলা দেশে ২।৩টি জেলার জন্য একজন করিয়া জনশিক্ষা কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং প্রতি জেলার জন্য আছেন একজন করিয়া Circle Assistant. প্রত্যেক জেলায় কয়েকজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বয়স্কদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই মাসের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল শিক্ষকেরা নিজেদের গ্রামে গ্রামে Circle Assistant-এর তত্ত্বাবধানে বয়স্কদের শিক্ষা দিতেছেন। জেলার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রে একজন করিয়া সামাজিক শিক্ষক (Social Teacher) নিযুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণ জনশিক্ষা-কেন্দ্রে বয়স্কদের জন্য বই, শ্লেট, ম্যাপ দেওয়া হইয়াছে এবং বিশেষ কেন্দ্রগুলিতে Radio এবং ছোটখাট একটা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে সরকারের কাজ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সত্য করিয়া জনশিক্ষা-বিস্তার করিতে হইলে আরও অনেক কিছু করিতে হইবে।

গ্রামে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য যে শিক্ষকরা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেন এবং রাত্রে বয়স্কদের শিক্ষা দেন। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে মাসে ১০৲ টাকা মাত্র বেতন দেওয়া হয়। যে প্রাথমিক শিক্ষকরা শিশুদেরই সন্তোষজনকভাবে পড়াইতে পারেন না বলিয়া অনেকেরই মত, তাঁহাদের উপর

বয়স্ক-শিক্ষার ভার দিলে কাজ যে কতটা আগাইবে, তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। আমার মনে হয়, প্রতি জেলায় একজন করিয়া Circle Assistant-এর পরিবর্তে প্রতি থানায় একজন করিয়া Circle Assistant থাকা উচিত। বয়স্কদের শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি গ্রামের জন্য একজন করিয়া বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকা উচিত। বয়স্কদের শিক্ষা বলিতে শুধু লিখিতে পড়িতে শিখাই বুঝায় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়েও উন্নতি-সাধন শিক্ষার অন্তর্গত। বয়স্কদের উপযুক্ত বই-এরও অভাব। এখন যে বইগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহা বয়স্ক-শিক্ষার উপযুক্ত নহে বলিয়া মনে হয়। বয়স্কদের শুধু লিখিতে পড়িতে শিখাইলেই চলিবে না—তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া যাহাতে ভুলিয়া না যায় তাহার জন্য প্রত্যেক থানায় Circle Assistant-এর পরিচালনায় থাকিবে একটি করিয়া ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার।

আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিলে প্রাথমিক শিক্ষার দোষই শুধু চোখে পড়ে না, মাধ্যমিক শিক্ষাও একেবারে দোষ-ত্রুটির বাহিরে নহে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেদের আকর্ষণীয় কিছুই নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের প্রবেশিকা পাশের একটা ছাপ জীবন-যাত্রার পথে Passport. তাই স্বার্থের খাতিরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায় ছেলেদের ভীড়। স্কুলের সঙ্গে ছেলেদের কোন প্রকার যোগ থাকে না; তাই দেখা যায়, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া শতকরা ৯০ জন যুবক প্রাক্তন বিদ্যালয়ের সহিত কোন সম্বন্ধই রাখে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোলমাল নানা রকম—Managing Committee ও শিক্ষকদের সহিত মনোমালিন্য, শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নাই মধুর সম্পর্ক। সরকারী, রেলওয়ে ও মিশনারী কয়েকটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া অন্যত্র শিক্ষকদের বেতন এতই কম যে, তাঁহারা স্কুলের সময়ের বাহিরে অন্য কিছু না করিলে দুইবেলা দুইটি খাইতে পাইবেন না। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের চাকুরীরও কোন নিশ্চয়তা নাই। শিক্ষা-জগতে কোথায় কি হইতেছে তাহার

খোঁজ রাখিবার সময় ও সুযোগ শিক্ষকদের নাই। বছরের শেষে ছেলে পরীক্ষায় পাশ করিলেই শিক্ষকদের দায়িত্ব শেষ হয়। Double Account রাখা এবং অন্যায়ভাবে শিক্ষককে তাড়ানো—ইহাও অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করা হইয়া থাকে।

বাংলা সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। এই প্রদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ছাত্র-সংখ্যা হিসাবে A, B, C ও D--এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন গুণসম্পন্ন শিক্ষকদের মাহিনার স্কেল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্কেল অনুযায়ী শিক্ষকদের মাহিনা যাহাতে দেওয়া হয়, তাহার জন্য সরকার হইতে প্রত্যেক বিদ্যালয়কে সাহায্য করা হইতেছে। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ ও ছাড়ানো জেলা স্কুল-পরিদর্শকের অনুমতি ছাড়া হইবে না। এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বৈত কর্তৃত্বাধীনে ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে এক কর্তৃত্বাধীনে আনিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সরকার শিক্ষক মহাশয়দের বেতনের যে হার নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা এই দুর্দিনে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতনের পার্থক্য এতই বেশী যে, তাহাতে শিক্ষকদের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকা কঠিন। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য যে বোর্ড স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষক-প্রতিনিধিদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের শতকরা ৮৫ জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের কৃষকেরা অশিক্ষিত—তাহারা কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞ। কৃষিকার্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করা সরকারের কর্তব্য। অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার বাহিরে কতকগুলি কলেজ চালু করিয়াছেন। কতকগুলি সাধারণ কলেজ বাড়াইবার প্রয়োজন বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। যদি

সরকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইত। পশ্চিম বাংলায় এক চুঁচুড়া ছাড়া আর কোন কৃষি-বিদ্যালয় নাই। প্রত্যেক জেলার সদরে যদি একটি করিয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র (Agricultural Farm) চালু করা হয়, তাহা হইলে গ্রামের লোকেরা উন্নত প্রণালীতে চাষ করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। থানায় থানায় যে সকল Agricultural Farm থাকিবে, সেখানকার কর্মচারীদের আর একটি কাজ হইবে গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপন করা। এখন সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের কৌলিন্য বজায় রাখিয়া সব সময় সাধারণ লোকেদের কাছ হইতে দূরে থাকেন। কোন সরকারী কর্মচারীদেরই এইরূপ মনোভাব থাকা উচিত নহে। বিশেষ করিয়া কৃষি-বিভাগের কর্মচারীদের সাধারণ কৃষকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইবে এবং তাহাদের কৃষিকার্যের মধ্যে কোথায় ত্রুটি হইতেছে, তাহা হাতে-কলমে দেখাইয়া দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে মাদ্রাজ সরকারের কার্য অনুকরণীয়।

১৯৪৩ সালে যখন সারা বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তখন অনেক পিতামাতা তাহাদের শিশু পুত্রকন্যাদের পথে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আবার পিতৃমাতৃহীন অনেক শিশুই দুর্ভিক্ষের সময় অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে কাঙ্গালের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। বিদেশী সরকার তখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শিশুদের জন্য বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন। কিন্তু এই সকল শিশু-সদন বা অনাথ আশ্রমগুলি পরিচালিত করিবার জন্য যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা উচিত, তাহা আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই শিশুগুলিকে সরকার চিরকালই বসিয়া খাওয়াইবেন এমন হইতে পারে না। এই সকল শিশুদের দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত নাগরিকরূপে অন্যান্য ব্যক্তিদের মত সমাজে স্থান করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং অনাথ শিশুদের এমন কোন বৃত্তি নিশ্চয়ই শিখাইতে হইবে, যদ্বারা অনাথ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া তাহারা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে।

অনেকেই বলেন, ভারতবর্ষ বিনা যুদ্ধে এবং বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা কি সত্য? ইংরাজকে আমরা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিই নাই বটে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এবং পরে স্বাধীনতার মূল্য কড়ায় গণ্ডায় আমাদিগকে পরিশোধ করিতে হইয়াছে। ইংরাজ এই দেশ শাসন করিবার সময় যেরূপ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদের দেওয়াল তুলিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ ভারত-ত্যাগের সময় তাহারা এই দেশকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামে দুই ভাগে ভাগ করিয়া গেলেন। ইহার অনিবার্য ফল এই হইল যে, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুই দেশেরই লোকজন নিঁজ নিজ এলাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা আমাদের এখানে খুব কম নহে। ইহাদের বসবাসের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করিতেছেন, কিন্তু ইহাদের ছেলেমেয়েদের কথা আমরা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? অল্প বয়সে শিশুদের অবচেতন মনে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহার ক্ষত কোনদিন শুকাইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা এখন দেখি যে, সাধারণ স্কুলের বাড়ীতে সকালে বা বিকালে উদ্বাস্তু শিশুদের বিদ্যালয় বসে এবং সাধারণ স্কুলের মতই পাঠ্য-পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলিই হয় শিক্ষকের পাঠদানের মাধ্যম। উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের জন্য কর্মকেন্দ্রিক কার্যসূচী রচনা করা দরকার। উদ্বাস্তু বিদ্যালয়ে নাচ-গান এবং খেলাধূলার অবতারণা করিয়া শিশু বয়সে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসার জন্য মনের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহা মুছাইয়া দিতে হইবে।

সঙ্গদোষে বা পরিবেশের চাপে অনেক শিশু অল্প বয়স হইতে মিথ্যা বলিতে, চুরি করিতে এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজ করিতে শিখে। এই সকল শিশুদের যদি সাধারণ অপরাধীর মত জ্ঞান করি এবং সাধারণ অপরাধীর মতই শাস্তি-বিধান করি, তাহা হইলে শিশুর প্রতি এবং দেশের প্রতি ঘোরতর অবিচার করিব। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিশু বুঝে না যে, সে যে কাজ করিতেছে তাহা কতদূর অন্যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই সে প্রলুব্ধ হইয়া অপরের প্ররোচনায় অন্যায়

করে। অনেক সময় দেখা যায়, চুরি করার পশ্চাতে লুক্কায়িত আছে শিশুর অবচেতন আত্মার প্রতি অবজ্ঞা। এই সকল বিপথে চালিত শিশুকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিয়া সুস্থ নাগরিকে গড়িয়া তোলা অন্যতম প্রধান ও পবিত্র কর্তব্য। এইজন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌ শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের অবহেলিত দুর্ভাগা দেশে এইরকম প্রতিষ্ঠানের কথা আজও শুনি নাই। বাঁকুড়া জেলার Borstal স্কুলে অল্পবয়স্ক অপরাধীদের পাঠানো হয়; কিন্তু উহাকে সংস্করণাগার না বলিয়া জেলখানা বলিলেই বোধ হয় সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়। সাধারণ জেলের মতই এখানে একজন অধ্যক্ষ থাকেন এবং সাধারণ বন্দীদের চেয়ে খুব বেশী ভাল ব্যবহার ছেলেরা পাইয়াছে এমন কথা শোনা যায় নাই। শিক্ষা-বিভাগ দ্বারা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ভারতে অন্ধ, বোবা, কালা প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ও ইন্দ্রিয়শক্তিবর্জিত শিশু কত আছে, তাহার সঠিক সংখ্যা আজ পর্যন্ত বাহির করা হয় নাই। ইহাদের সংখ্যা যে কয়েক লক্ষ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? সারা ভারতবর্ষে অন্ধদের জন্য ১০।১২টির বেশী বিদ্যালয় নাই এবং বোবা, কালাদের জন্য বিদ্যালয় আরও কম। এই সামান্য কয়টি বিদ্যালয়ের খরচ এতই বেশী যে, কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন লোকেদের ছেলেরাই এখানে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে। সাধারণ ঘরের অন্ধ, বোবা, কালা শিশুরা সমাজের গলগ্রহ হইয়া চক্ষুজল লইয়াই কোনরকমে না মরিয়া বাঁচিয়া থাকে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, এই শিশুরা কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়হীন হইলেও তাহাদের সাধারণ বুদ্ধি মোটেই কম নহে। কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় বিকল করিয়া প্রকৃতিদেবী ইহাদের যে ক্ষতি করিয়াছেন, অন্য একটি ইন্দ্রিয়ের আরও একটু বেশী শক্তি দিয়া সে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাই, শিক্ষার সুযোগ পাইলে ইহারাও দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হইতে পারে। প্রতি জেলার অন্ধ, বোবা ও কালাদের জন্য একটি করিয়া অবৈতনিক বিদ্যালয়

স্থাপন করা দরকার এবং যাহাদের ঘরে বোবা, কালা শিশু আছে তাহাদের বাধ্যতামূলকভাবে এই স্কুলে ছেলে পাঠাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-জগতে যে সকল সমস্যা প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। পরাধীন ভারতে এই সমস্যাগুলির প্রত্যেকটিই ছিল। তবে তখন আমরা এই সকল বিষয়ে বিদেশী শাসকদের ঘাড়ে দোষ চাপাইতাম এবং শাসকবৃন্দও অর্থের অভাব এই অজুহাতে আমাদের নিরস্ত করিয়া রাখিতেন। আজ আর বিদেশী শাসক নাই এবং পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার সুযোগও আর নাই। এখন আমাদের নিজেদের সমস্যা নিজেদের মাঁথায় লইয়া বিচারপূর্বক তাহার সমাধান না করিতে পারিলে বিশ্বদরবারে আমাদের অক্ষমতার গ্লানি ও লজ্জার সীমা থাকিবে না।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সমস্যা

দুই শত বৎসরের পরাধীনতার পর তিন বৎসর হইল আমরা স্বাধীন হইয়াছি। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার সঙ্গেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয় নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন ; কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সকল জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা মনে করার কোনই কারণ নাই। অন্ন, বস্ত্র, আবাস, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই কয়টিই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সকল সমস্যাগুলির দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সমাধানের চেষ্টাও চলিতেছে। আমাদের দেশে শিক্ষার সমস্যা কি কি এবং তাহা সমাধান করিবার জন্য কি কি করা হইতেছে, আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

দুই শত বৎসর ইংরাজের অধীনে থাকিয়া আমাদের লাভ-লোকসান কি হইয়াছে, তাহার অনুপাত বাহির করিবার দিন এখনও আসে নাই। তবে একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, অন্যান্য স্বাধীন জাতির তুলনায় শিক্ষা-বিষয়ে আমরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। একশত বৎসর পূর্বে জাপানের অবস্থা আমাদের চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না ; পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের রাশিয়ার সহিত আমাদের অনেক বিষয়েই মিল ছিল। কিন্তু আজ আমরা রাশিয়া ও জাপানের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এতদিন আমরা সকল দোষ-ত্রুটি ইংরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেদের সাফাই গাহিয়াছি, কিন্তু আজ স্বাধীন হইবার পর সমস্ত দায়িত্ব মাথায় লইয়া ধীরভাবে সমস্যাগুলিকে একে একে বিচার করিয়া সমাধানের পথ বাহির করিতে হইবে।

কথায় বলে "ধনে প্রাণে মারা", ইংরাজ আমাদিগকে তাহাই করিয়াছে। দুই শত বৎসর শোষণের অনিবার্য ফলে সোনার ভারত আজ পৃথিবীর দরিদ্রতম

দেশে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে নিদারুণ দুঃখের কথা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মর্মান্তিক পরিতাপের বিষয় এই যে, ইংরাজ শুধু আমাদের বাহিরের ধন-সম্পদই শোষণ করে নাই, আমাদের অন্তরের আত্মাকেও শোষণ করিয়াছে। সে বিভ্রান্ত করিয়াছে আমাদের দৃষ্টিকে, বিকৃত করিয়াছে আমাদের রুচিকে। ইংরাজের অনুকরণে এবং ইংরাজ মনিবকে সন্তুষ্ট করিবার মোহে আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী হইয়াও শীতপ্রধান দেশের উপযোগী কোট-প্যাণ্ট-টাই পরিয়াছি। ইংরাজ আজ চলিয়া গিয়াছে, তবু আমরা বিলাতী পোষাকের মোহ ছাড়িতে পারিতেছি না। এই দেশের একটি ভাল ছাত্রকেও আমরা তাহার প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান দিই না; কিন্তু একজন অতি সাধারণ ছেলে যখন বিলাত বা আমেরিকার কোন অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া আসে, তখন আমরা তাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচি। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও আমরা অনেক সময় শিক্ষিত বলিয়া মনে করিতে নাক সিঁটকাই; কিন্তু যে বার বার অকৃতকার্য হইয়াও কোনরকমে বি.এ. পাশ করিয়াছে, তাহাকে শিক্ষিত বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা তো হয়ই না উপরন্তু গৌরববোধ করি। মহাত্মাজী প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে আমরা বিচার করিতে চাহি আমেরিকান্ শিক্ষাবিদ্ মনীষী "ডিউই"-এর শিক্ষা-পদ্ধতির কষ্টি-পাথরে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই পরাজিত মনোভাবের পরিবর্তন না হইবে, ততদিন আমরা সভ্যজগতে নিজস্ব কিছু দান করিতে পারিব না।

ইংরাজের অধীনে থাকার সময় ইংরাজী শিক্ষাকে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অফিসের কাজকর্ম হইত ইংরাজীতে; এক প্রদেশের একজন তথাকথিত শিক্ষিত লোকের ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত লোকের সহিত কথা কহিতে হইত ইংরাজীতে। স্কুল-কলেজে পড়ানো হইত ইংরাজীতে। ফলে ইংরাজী আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এখনও যদি একটা বিদেশী ভাষার সাহায্যে আমাদের রাষ্ট্রের কার্য চালাইতে হয়, তাহাতে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকে না।

সেইজন্যই প্রয়োজন হইল একটা দেশীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার গৌরব দান করা। ভারতবর্ষে বহু ভাষা প্রচলিত আছে। সাহিত্য মর্যাদায় ইহাদের অনেকগুলিই একে অপরের সমকক্ষ। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হইবে, ইহাই ছিল এক কঠিন সমস্যা। সম্প্রতি ভারতের গণপরিষদে ঠিক হইয়াছে যে, হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা। এতদিন পর্যন্ত ইংরাজী ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল। দেশের মধ্যে যাঁহাদিগকে শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইত, তাঁহারা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেইজন্য স্থির হইল, আগামী পনর বৎসর পর্যন্ত ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া রাখা হইবে। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কীয় বিঘোষিত নীতি যাহাই হউক না কেন, আমাদিগকে এই কথাটি মনে রাখিতেই হইবে যে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযোগ রাখিতে হইলে আমাদের ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি সমধিক প্রচলিত বৈদেশিক ভাষা শিখিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল ব্যতিরেকে ভারতের অন্যত্র প্রত্যেককে অন্ততঃ তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জানা উচিত, শাসন-ব্যবস্থা কি প্রকার এবং বুঝিতে পারা উচিত যে, শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রত্যেকের কিছু ভাবিবার এবং বলিবার আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বুঝিবে কয়জনে? শতকরা ১০ জন মাত্র একটু লেখাপড়া জানে। নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া একান্ত দরকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অক্ষরজ্ঞানহীন বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষা দিবার উপযুক্ত লোক কোথায়? অশিক্ষিত বয়স্কদের "মূক মুখে ভাষা" দেওয়াই দাঁড়াইয়াছে স্বাধীন ভারতের একটা প্রধান সমস্যা।

দেশের সকল লোকই উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত নহে এবং সকলের জন্য উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করাও সম্ভব নহে। কিন্তু সংসারে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার

উপযুক্ত শিক্ষা বোধ হয় প্রত্যেক নরনারীর পাওয়া উচিত এবং তাহাদের পাইবার অধিকারও আছে। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশের লোকে উপলব্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভায় "পাশ"ও হইয়াছে। কিন্তু বহুদিন যাবৎ ইংরাজ সরকার অর্থের অভাব—এই অজুহাত দেখাইয়া প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীনভাবে চালু করিবার চেষ্টা করেন নাই। আজিকার জাতীয় সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরিকল্পনা দুর্গত দেশের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহাতে অল্প ব্যয়ে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা যে বিদেশী ভাবাপন্ন আমাদের দেশের কর্ণধারগণ আজও ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই—গান্ধীজী পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত বুনিয়াদী পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন কি বিদেশী শিক্ষাবিদ্‌দের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিবেন। সেইজন্য দেখিতে পাই, আজও আমাদের দেশের লোকেরা তর্ক করে মহাত্মাজী প্রদর্শিত বুনিয়াদী শিক্ষা ভাল, না "ডিউই" প্রবর্তিত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ভাল।

সম্পূর্ণ